গয়নার বাক্স
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গয়নার বাক্স

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

“রা-স্বা”

শ্রী বিপ্লব কুমার গুপ্ত
ইষ্টস্বার্থপ্রাণেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অনেকের গল্প
অসুখের পরে
আদম ইভ ও অন্ধকার
আলোয় ছায়ায়
আলোর গল্প, ছায়ার গল্প
আশ্চর্য ভ্রমণ
উজান
উপন্যাস সমগ্র (১ম-৯ম খণ্ড)
ঋণ
কাগজের বউ
কাপুরুষ
কালো বেড়াল সাদা বেড়াল
কীট
কোনও দিন এরকমও হয়
কোলাজ
ক্ষয়
খেলনাপাতি
গতি
গুহামানব
ঘুণপোকা
ঘটনাক্রমে
চক্র
চুরি
চোখ
জাল
দ্বিতীয় সত্তার সন্ধানে
ধন্যবাদ মাস্টারমশাই
নরনারী কথা
নানা রঙের আলো
নীচের লোক উপরের লোক
নীলু হাজরার হত্যারহস্য
পরিহাটির হরিণ
পারাপার
পার্থিব
পিদিমের আলো
প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম
ফজল আলি আসছে
ফুলচোর
বনদেবী ও পাঁচটি পায়রা
বাঁশিওয়ালা
বিকেলের মৃত্যু
ভুল করার পর
মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক
মানবজমিন
ম্যাডাম ও মহাশয়
যাও পাখি
রহস্য সমগ্র
লাল নীল মানুষ
শিউলির গন্ধ
শ্যাওলা

ঝাঁপি
দশটি উপন্যাস
দিন যায়
দূরবীন
দ্বিচারিণী
সতীদেহ
সন্ধি প্রস্তাব
সাঁতারু ও জলকন্যা
সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
হৃদয়বৃত্তান্ত

সূচিপত্র

গয়নার বাক্স

॥ সোমলতা ॥

আমার স্বামীর নাম চকোর মিত্রচৌধুরি। চৌধুরিটা অবশ্য ছেঁটে ফেলেছেন। চকোর মিত্র নামেই পরিচয়। আমার আঠারো বছর বয়সে যখন বিয়ে হয় তখন আমার স্বামী ভেরেণ্ডা ভেজে বেড়ান। গুণের মধ্যে তবলা বাজাতে পারেন, আর বি.এ পাশ। ওঁদের বংশে কেউ কখনও চাকরি করেনি। পূর্ববঙ্গে ওদের জমিদারি ছিল। তার জের ছিল আমার বিয়ে অবধি। শোনা গিয়েছিল, এখনও নেই-নেই করেও যা আছে তাতে ছেলেকে আর ইহজীবনে চাকরি করতে হবে না। বউ-ভাতের আয়োজন এবং শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া আমার গয়নাগাঁটি দেখে আমার বাপের বাড়ির লোকদেরও ধারণা হয়েছিল যে, কথাটা বুঝি সত্যি।

পড়তি বনেদি পরিবারের খুব বারফাট্টাই থাকে। লোক-দেখানো বাহাদুরি করার সুযোগ তারা ছাড়ে না। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির ভিতরকার নানা ছোটখাট অশান্তি আর তর্কবিতর্কের ভিতর দিয়ে জানতে পারি যে, আমার বিয়েতে খরচ করতে গিয়ে তাদের সম্বল প্রায় শেষ। উপরন্তু বাজারে বেশ ধারও হয়েছে।

শাশুড়ি মানুষটি বেশ ভালই ছিলেন। শান্তশিষ্ট এবং খুবই সমবেদনাশীলা। গরিব এবং ধার্মিক পরিবারের মেয়ে তিনি। এ বাড়ির সঙ্গে ঠিকঠাক মিলেমিশে যেতে পারেননি। তিনি আমাকে ডেকে একদিন কাছে বসিয়ে বললেন, ফুচু-র (আমার স্বামীর ডাক নাম) সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে। সেটা তোমার কপাল। ফুচু ছেলে খারাপ নয়। কিন্তু আমাদের শুধু এখন খোলাটা আছে, সার নেই। বিয়ে দিয়েছি, যদি বউয়ের ভাগ্যে ওরও ভাগ্য ফেরে। কোমর বেঁধে ওর পেছনে লেগে থাকো। আস্কারা দিও না। একটু লাই দিলেই শুয়ে-বসে সময় কাটাবে। এ বাড়ির পুরুষদের ধাত তো জানি। বড় কুঁড়ে।

কথাটা শুনে আমার দুশ্চিন্তা হল। বিয়ের পর যদি আমার স্বামীর ভাগ্য না-ফেরে তবে কি এরা আমাকে অলক্ষুণে বলে ধরে নেবেন?

শাশুড়ি দুঃখ করে বললেন, এ সংসার চলছে কিভাবে তা জানো? জমি আর ঘরের সোনাদানা বিক্রি করার টাকায়। বেশিদিন চলবে না। যদি ভাল চাও তো ফুচুকে তৈরি করে নাও।

ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি কি পারব মা? উনি কি আমার কথা শুনে চলবেন? যা রাগী মানুষ!

শাশুড়ি হেসে ফেললেন, পুরুষের রাগকে ভয় পেতে নেই। ওদের রাগটা হল শুধুই পটকার ফাঁকা আওয়াজ। বেশি পাত্তা দিও না।

কী করতে হবে তা কি আমাকে শিখিয়ে দেবেন?

ওসব শেখাতে হয় না মা। তোমার মুখ দেখে তো মনে হয় বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। নিজেই ঠিক করে নিতে পারবে কী করতে হবে।

শাশুড়ির সঙ্গে সেইদিন থেকেই আমার একটা সখিত্ব গড়ে উঠেছিল। শাশুড়িদের সম্পর্কে যা সব রটনা আছে তাতে বিয়ের আগে খুব ভয় ছিল। আমার ভাগ্য ভাল যে, শাশুড়ি দজ্জাল নন।

তবে দজ্জালের অভাব সংসারে কখনও হয় না। আমার একটিমাত্র জা, বয়সে বড়। ইনি প্রচণ্ড দজ্জাল। আর একজন বালবিধবা এক পিসশাশুড়ি। বলতে গেলে ইনিই সংসারের সর্বময় কত্রী। অল্পবয়সে বিধবা হওয়ায় তাঁর দাদা ও ভাই তাঁকে স্নেহবশে তোলা-তোলা করে রেখেছেন। ফলে এ সংসারে এঁর দাপট দেখার মতো।

উত্তরবঙ্গের যে শহরে শ্বশুরবাড়ির লোকদের বাস তা ঘিঞ্জি, নোংরা এবং ছোট। জীবনযাত্রায় কোনও বৈচিত্র্য নেই। এঁদের বাড়িটা বেশ বড়। পাকিস্তানে এঁদের আরও বড় এবং অনেকগুলো বাড়ি, প্রচুর জমি ইত্যাদি ছিল। এ বাড়িটাও এঁদের আগে থেকেই ছিল। আমার দাদাশ্বশুর তৈরি করিয়েছিলেন। জমিদারবাড়ি যেমন হয় তেমনি। অনেক ঘর, খিলান, গম্বুজওলা জবরজং ব্যাপার। ভাগিদারও কম নয়। দেশ পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় আত্মীয়স্বজনরা এসে সবাই এ বাড়িতেই আশ্রয় নেন। তাঁদের প্রথমে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল দুর্গত হিসেবে। কিন্তু পরে তাঁরা দাবি তোলেন, এ বাড়ি যখন এস্টেটের টাকাতেই তৈরি তখন এতে তাঁদেরও ভাগ আছে। বাড়িটা দাদাশ্বশুরের নামে, ওয়ারিশান আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, এক জ্যাঠাশ্বশুর ও তাঁর মেয়ে, ভাসুর ও স্বামী। কিন্তু সেটা হল কাগজপত্রের মালিকানা। যাঁরা দখল করে বসেছেন তাঁরা দখল ছাড়েননি। মামলা-মোকদ্দমা চলছে অনেকদিন ধরে। সেইসঙ্গে কিছু ঝগড়া কাজিয়াও। তবে পালপার্বণে, বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে গোটা পরিবার একত্র হয়ে যায়।

এসব বুঝে উঠতে এবং লোকগুলোকে চিনে নিতে আমার কিছু সময় লেগেছিল। একটু বড় বড় কথা বলা এবং সুযোগ পেলেই দেশের বাড়ির জমিদারির গল্প করা এঁদের একটা প্রিয় অভ্যাস। এ বাড়ির পুরুষদের চাকরি-বাকরি-ব্যবসা ইত্যাদিতে আগ্রহ ছিল না। বেশি নজর ছিল ফূর্তির দিকে। তবে আমার যখন বিয়ে হয় তখন বাঁচার তাগিদে কেউ কেউ রুজিরোজগারে মন দিয়েছেন।

আমার স্বামী সম্পর্কে বলতে গিয়েই এত কথা বলা। স্বামী জমিদারবাড়ির ছেলে, আদরে আলস্যে মানুষ। লেখাপড়ার চাড় কম ছিল বলে গড়িয়ে গড়িয়ে বি.এ পাশ। মেজাজটা একটু উঁচু তারে বাঁধা। যখন তবলার রেওয়াজ করেন তখন একটুও বিরক্ত করা চলবে না। ঘুম থেকে ডেকে তুললে রেগে যান। উনি উঠবেন ওঁর ইচ্ছেমতো। বউকে নিয়ে কোথাও যাওয়া ওঁর পোষায় না। স্ত্রীর বুদ্ধি পরামর্শ নেওয়া ওঁর কাছে অপমানজনক।

বয়সে উনি আমার চেয়ে বেশ কিছুটা বড়। আমার আঠারো, ওঁর বত্রিশ। বয়সের এ পার্থক্য নিয়ে আমি আপত্তি তুলিনি, কারণ, আমি একটু বয়স্ক মানুষকেই স্বামী হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম। আর আমার বাপের বাড়ি এতই গরিব যে, পাত্রর বয়স বা চাকরি নিয়ে খুঁতখুঁত করা আমাদের পক্ষে শৌখিনতা। তবে বলতে নেই, বয়স বত্রিশ হলেও আমার স্বামী দেখতে অতি চমৎকার। টান লম্বা, ফর্সা, ছিপছিপে, একমাথা ঘন কালো চুল, মুখখানাও দারুণ মিষ্টি। গায়ে যে নীল রক্ত আছে তা চেহারা দেখেই বোঝা যায়। বয়সের পার্থক্য এবং ওঁর গুরুগম্ভীর রকমসকম দেখে আমি ওঁকে 'আপনি' করেই বলতাম। সেই অভ্যাস আজও রয়ে গেছে।

বিয়ের কয়েকদিন বাদে ওঁর মুড বুঝে আমি একদিন বললাম, আচ্ছা, আমি এ বাড়িতে কার অন্ন খাচ্ছি তা কেন বুঝতে পারি না বলুন তো!

উনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, তার মানে?

আমি এ বাড়িতে কার অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি তা জানতে ইচ্ছে করে।

ওটা কোনও প্রশ্ন হল? তুমি আমি সবাই একই অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছি।

আমি যে বুঝতে পারছি না।

বুঝবার দরকার কি? ভাত তো জুটছে, তা হলেই হল।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। ওটা কাজের কথা নয়। কেউ একজন তত জোগান দিচ্ছেন। তিনি কে?

উনি এ সময়ে বিরক্ত হতে পারতেন, আমাকে ধমকও দিতে পারতেন। আমি অন্তত সেরকমই প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু উনি রাগ করলেন না। গভীর চিন্তিত মুখ করে বললেন, কেন, তুমি কি জানো না?

আমি খুব ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে বললাম, আপনি রাগ করবেন না। যা জানি সেটা একটুও সম্মানজনক নয়। আমি শুনেছি, সোনা আর জমি বেচে এ সংসার চলে।

উনি হ্যাঁ না কিছু বললেন না। বিকেলের চা খাচ্ছিলেন একতলার জানালার ধারে বসে। জানালার বাইরে কাঁচা ড্রেন, তার ওপাশে নোনা ধরা দেওয়াল। ঘরে পিলপিল করছে মশা, ড্রেনের একটা বিচ্ছিরি গন্ধ আসছে। ভারী বিষণ্ণ আর ভার একটা বিকেল।

উনি খুব ধীরে ধীরে চা খেয়ে কাপটা পুরোনো আমলের কাঠের গোল টেবিলটার ওপর রেখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, কথাটা ঠিক। তুমি আরও কিছু বলতে চাও বোধহয়?

আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ওঁর মুখটা গম্ভীর, গলাটা যেন আরও গম্ভীর। কিন্তু ভয় পেতে শাশুড়িই বারণ করেছেন। আমি বললাম, ঘরের সোনাও লক্ষ্মী, জমিও লক্ষ্মী। শুনেছি এসব বেচে খাওয়া খুব খারাপ।

উনি গম্ভীর বটে, কিন্তু অসহায়ও। সেটা ওঁর পরের কথায় প্রকাশ পেল। উনি একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, কী করা যাবে তা তো বুঝতে পারছি না।

আমি একটু সাহস করে বললাম, দেখুন, সোনাদানা অফুরন্ত নেই। জমিও বোধহয় শেষ হয়ে এল। আমাদের কি সাবধান হওয়া উচিত নয়?

উনি আমার দিকে অকপটে চেয়ে থেকে বললেন, আমাদের বলতে? তুমি কি তোমার আর আমার কথাই ভাবছ?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, তা কেন? এ বাড়ির সকলে মিলেই তো আমরা।

উনি বিমর্ষ মুখে বললেন, বিয়েতেও আমাদের অনেক খরচ হয়ে গেছে। আচ্ছা, হঠাৎ কথাটা তুললে কেন বলো তো!

আমি গরিব ঘরের মেয়ে, সেটা তো জানেন! গরিবদের বড্ড কষ্ট। আপনাদের যদি গরিব হয়ে যেতে হয় তা হলে কষ্টটা সহ্য হবে না। আপনারা তো আদরে মানুষ।

তোমরা গরিব বলে এ বাড়ির কেউ কখনও তোমাকে অপমান করেনি তো!

তা করেনি। কিন্তু গরিব বলে মনে মনে আমার সবসময় সঙ্কোচ হয়।

উনি মৃদুস্বরে বললেন, সঙ্কোচের কিছু নেই। তোমরা তো আর নিজেদের অবস্থা গোপন করনি। আমরাও জেনেশুনেই কাজটা করেছি। তোমার কি মনে হয় আমি একটা অপদার্থ?

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, তা কেন? আপনাকে আমি কতটা শ্রদ্ধা করি তা আপনি হয়তো জানেন না। আপনি অপদার্থ হবেন কেন? তা নয়। আপনি ইচ্ছে করলেই রোজগার করতে পারেন তো!

কিভাবে করব বলো তো! আমি মোটে বি.এ পাশ। এতে বড়জোর একটা কেরানিগিরি জুটতে পারে। তার বেশি কিছুই নয়, এবং সেটাও পাওয়া শক্ত। চাকরি করব বলে তো কখনও ভাবিনি।

চাকরি না করলেই কি নয়? ব্যবসাও তো করা যায়।

ব্যবসা! সে তো দোকানদারি। ওটা পারব না।

আমি ওঁর ভাব দেখে হেসে ফেললাম। বললাম, আচ্ছা, এখন ওসব কথা থাক। আপনি চা খেয়ে বেরোতে যাচ্ছিলেন, আমি আটকে রেখেছি আপনাকে। আপনি ঘুরে আসুন, পরে দুজনে মিলে কিছু একটা পরামর্শ করব। আপনি তাতে রাগ করবেন না তো!

উনি জবাব দিলেন না, চিন্তিত মুখে বেরিয়ে গেলেন। অন্যমনস্ক ছিলেন বলেই বোধহয় আমার কথাটা ভাল করে কানে যায়নি।

মফস্বল শহরগুলোয় থাকা ভারী একঘেয়ে। বেড়ানোর জায়গা নেই, সিনেমা হল ছাড়া আর কোনও আমোদমোদ নেই, তাও পুরোনো বস্তাপচা ছবি। একমাত্র এ বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে কুটকচালি করা। এ বাড়িতে তাও বারণ। যার তার বাড়িতে যাওয়া পরিবারের মর্যাদার পক্ষে হানিকর। সুতরাং সন্ধের পর ভারী বিষণ্ণ আর একা লাগে। কাঁদতে ইচ্ছে করে। মা-বাবার জন্য মন কেমন করা তো আছেই। ছেলেরা তবু আড্ডা মারতে বা তাসটাস খেলতে যায়, কিন্তু মেয়েদের সে উপায়ও তো নেই। আমার শাশুড়ি সন্ধের পর জপতপ করেন। জা আমাকে সহ্য করতে পারেন না। সুতরাং আমি বড্ড একলা।

বাড়ির যে অংশটায় আমরা থাকি তা দক্ষিণ দিকে। একতলা, দোতলা এবং তিনতলা মিলিয়ে ছ-সাতটা ঘর আমাদের ভাগে। উত্তর ভাগে আরও সাত-আটখানা ঘরে থাকে শরিকরা। আমাদের ভাগে লোকসংখ্যা কম। ভাসুরের ছেলেপুলে নেই, শুধু দেবা-দেবী। তাঁরা দোতলায় দুখান ঘর নিয়ে থাকেন। দুখানা ঘর নিয়ে থাকেন জ্যাঠাশ্বশুর। একতলায় একখানা ঘরে আমরা। সামনের দিকে দুখানা ঘর শ্বশুর-শাশুড়ির। তিনতলায় থাকেন আমার পিসশাশুড়ি। তিনখানা বড় বড় ঘর তাঁর কিসে লাগে কে জানে! আমি পারতপক্ষে ওঁর কাছে যাই না। গেলেই এমনভাবে তাকান যে, রক্ত জল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কোনও কারণ ঘটলে তিনতলা থেকে উনি এমন চেঁচান যে, গোটা বাড়ির লোক শুনতে পায়। গলার এত জোর আমি আর দেখিনি। বিয়ের পর আমাকে উনি একদিন ওঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খুব ভারী একছড়া খাঁটি সোনার হার পরিয়ে দিয়েছিলেন গলায়। এ পর্যন্ত বেশ ভালই ছিল ব্যাপারটা। কিন্তু তারপর আমাকে এমন অনেক ঠেস-দেওয়া কথা বলেন, এত অপমানজনক যে চোখে জল এসেছিল। তেজী মেয়ে হলে গলা থেকে হার খুলে ফেরত দিত। আমি তা পারিনি। উনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যা বললেন, তা হল, কাঙালী বাড়ি থেকে মেয়ে আনাতে উনি মোটেই খুশি হননি। নিশ্চয়ই এ বাড়ির ঠাটবাট দেখে আমার মাথা ঘুরে গেছে। আমার শাশুড়ির মুণ্ডুপাত করলেন কিছুক্ষণ, আমার মতো হা-ঘরে বাড়ির মেয়ে পছন্দ করে আনার মূলে নাকি উনিই, তা হবে না-ই বা কেন, শাশুড়িও নাকি হা-ঘরে বাড়িরই মেয়ে। ইত্যাদি।

আমার মাঝে মাঝে বিকেল বা সন্ধেবেলায় খুব ছাদে যেতে ইচ্ছে করে। ঘরগুলো এত বিষণ্ণ, এত প্রকাণ্ড, আর এত ভুতুড়ে যে আমি বিকেল আর সন্ধেবেলাগুলো কিছুতেই ঘরে বসে কাটাতে পারি না। ছাদে গেলে তবু ফাঁকা বাতাসে কিছুক্ষণ শ্বাস নেওয়া যায়। একটু পায়চারি করতে পারি, গুনগুন করে গান গাইতে পারি। বাড়ির ছাদটা এজমালি বলে শরিকদের পরিবারের লোকজনও আসে। তাদের মধ্যে দু-চারজন আমার বয়সী মেয়ে-বউ আছে। দু-চারটে কথা হতে পারে তাদের সঙ্গেও। কিন্তু ছাদে যাই না পিসির ভয়ে। খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠলেও উনি ঠিক টের পান। ঘরের দরজা খোলা রেখে সিঁড়ির দিকে মুখ করেই বসে থাকেন।

কিন্তু সেদিন আমার ঘরে এতই খারাপ লাগছিল যে, পিসির ভয়কে মাথায় নিয়েও আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে যাচ্ছিলাম। আমার অনেক চিন্তা, অনেক ভয়, অনেক উদ্বেগ। বিয়ের পরেকার যে আনন্দ অন্য সব মেয়ের হয় আমার যেন সেরকম নয়। আমার মনে হচ্ছিল, বিবাহিত জীবনে আমাকে অনেক ভার বইতে হবে, যা আমি হয়তো পেরে উঠব না।

তিনতলায় উঠছি খুব সন্তর্পণে। পা টিপে টিপে। সিঁড়ির মুখোমুখিই পিসির ঘর। আলো জ্বলছে। আমি উঁকি মেরে দেখে নিলাম, পিসি রোজকার মতোই সিঁড়ির দিকে মুখ করে বসে আছেন। ফসা রং, বড় বড় চোখ যেন গিলে খাচ্ছে চারদিককে। একসময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন। সৌন্দর্যের কোনও আরতি হয়নি, ভোগে লাগেনি কারও, যৌবন বয়ে গেছে বৃথা। পিসির জীবনটা যে কিরকম হাহাকারে ভরা তা আমি জানি। ভাগ্যের ওপর, দেশাচার কুলাচারের ওপর রাগ করে লাভ নেই। তাই তাঁর রাগ নিরীহদের ওপর ফেটে পড়ে। আমি ওঁকে ভয় পাই ঠিকই, কিন্তু ঘেন্না করি না।

সিঁড়ির শেষ কয়েকধাপ বাকি থাকতে আমি থামলাম। সিঁড়ির মুখটা পেরোতে সত্যিই ভয়-ভয় করছিল। আমি আর একবার সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে একটু অবাক হয়ে গেলাম। পিসি স্থির হয়ে বসেই আছেন। চোখ খোলা এবং পলকহীন। মুখটা হাঁ হয়ে আছে। কেন কে জানে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। দৃশ্যটা স্বাভাবিক নয়।

আমি সিঁড়ি কটা ডিঙিয়ে পিসির ঘরে ঢুকলাম। পিসিমা! ও পিসিমা!

পিসিমা! ও পিসিমা!

পিসিমা জবাব দিলেন না। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে মস্ত বড় মোড়ায় যেমন বসেছিলেন তেমনই বসে রইলেন।

আমি সাবধানে তাঁকে ছুঁলাম। নাকের কাছে হাত ধরলাম। তারপর আমার নিজের হাত-পা যেন হিম হয়ে এল। পিসিমা বোধহয় বেঁচে নেই।

তাড়াতাড়ি ছুটে নীচে আসতে যাচ্ছি। হঠাৎ পিছন থেকে পিসিমার গলা পেলাম, দাঁড়াও। খবরটা পরে দিলেও হবে।

আমি চমকে ফিরে তাকালাম। তা হলে কি পিসিমা মারা যাননি। কিন্তু একই রকমভাবে বসে আছেন। চোখ বিস্ফারিত, মুখ হাঁ করা। সেই হাঁ করা মুখ একটুও নড়ল না। কিন্তু পিসিমার কথা শোনা যেতে লাগল, মরেছি রে বাবা, মরেছি। তোমাদের আপদ বিদেয় হয়েছে।

আমি জীবনে এত ভয় পাইনি কখনও। হার্টফেল হবে নাকি আমার।

তিনতলাটা খুব পছন্দ তোদের, না? আমি মলেই এসে দখল নিবি বুঝি? আর গয়না, টাকা ভাগবাঁটোয়ারা করবি? কোনওটাই হবে না। দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়! আয় ইদিকে! কাছে আয়!

ওই হুকুমটা যেন চুম্বকের মতোই একটা জিনিস। ধীরে ধীরে পিসির দিকে টেনে নিচ্ছে আমাকে।

কোথায় পালাচ্ছিলি?

আমি জবাব দিতে পারি না। গলা বোজা। শুধু চেয়ে আছি। পিসির মৃত চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ হয়ে আছে।

আঁচল থেকে চাবি খুলে নে। উত্তরের ঘরে যাবি। কাঠের বড় আলমারিটা খুলে দেখবি তলায় চাবি-দেওয়া ড্রয়ার, ড্রয়ার খুললে একটা আলপাকা জামায় মোড়া কাঠের বাক্স পাবি। নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে

রাখবি। কেউ টের না পায়। ভাবছিস তোকে দিচ্ছি? কচুপোড়া। মরেছি টের পেলে সব এসে ভাগাড়ে শকুনের মতো পড়বে। তাই সরিয়ে দিচ্ছি। লুকিয়ে রাখবি। ও আমার সাধের গয়না, বিধবা বলে পরতে পারিনি। যদি কখনও পরিস তা হলে ঘাড় মটকে দেব। একটা রতিও যেন এদিক ওদিক না হয়। যা।

মৃতা পিসিমার আঁচল থেকে কিভাবে চাবি খুলেছিলাম আর কিভাবে সেই গয়নার বাক্স বের করেছিলাম তার কিছুই আমি বলতে পারব না। আমার কিছুই স্পষ্ট করে মনে পড়ে না। তবে আমি খুব সচেতনভাবে কাজটা করিনি।

বাক্সটা আঁচলে আড়াল করে ঘরে আসবার সময় দুজন আমাকে দেখতে পায়। একজন আমার জা বন্দনা। বন্দনাদি তখন চাকর ভজহরিকে ডাকতে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে মুখ করে ছিলেন। ভজহরি তার ডাকে উঠে আসছিল। আমি জাকে পাশ কাটিয়ে যখন নেমে যাচ্ছিলাম তখন আমি প্রায় দৌড়োচ্ছি। না তাকিয়ে দেখে ভজহরিকে বললেন, ওটা বউ না ঘোড়া? গেছে মেয়েছেলে বাবা!

ভজহরি আমাকে নামতে দেখে দেওয়ালের দিকে সরে দাঁড়িয়েছিল। সেও আমাকে দেখল।

ওপর থেকে জা ভজহরিকে বলল, কাঁকালে ওটা কী নিয়ে গেল রে? ভজহরি বলল, বাক্সমতো কী যেন!

ভজহরি বলল, বাক্সমতো কী যেন!

বাক্স! বাক্স পেল কোথায়?

আমি এটুকুই শুনতে পেয়েছিলাম। ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে আমার নতুন ট্রাঙ্কের একদম তলায় বাক্সটা লুকিয়ে রেখে চাবি বন্ধ করে দিলাম। নামিয়ে আনার সময় খেয়াল হয়নি, বাক্সটা কতটা ভারী। রাতের দিকে যখন হাতটা ব্যথা করতে লাগল তখন বুঝলাম।

পিসিমা যে মারা গেছেন এ খবরটা কি আমার সবাইকে দেওয়া উচিত? কিন্তু খবর দেব কি? ঘরে এসে এমন বুক কাঁপতে লাগল, এমন হাঁফ ধরে গেল, মাথাটা এত গণ্ডগোল লাগতে লাগল যে, আমাকে কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে হল। ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছে কিনা, না কি কী হল, সেটাও ঠিক করতে পারছিলাম না।

তিনতলায় সন্ধের পর কেউ যায় না। রাতে পিসিমা খৈ আর দুধ খান। খৈ তাঁর ঘরেই থাকে। রান্নার ঠাকুর নন্দ ঘোষাল রাত্রে দুধ গরম করে পৌঁছে দিয়ে আসে।

নন্দ ঘোষালই খবরটা এসে নীচে দিল, পিসিঠাকরুন কেমন যেন হয়ে আছেন। লক্ষণ ভাল নয়।

খবর শুনে আমার শাশুড়ি ওপরে গেলেন। তারপর চেঁচিয়ে ভজহরিকে ডেকে বললেন, ওরে কর্তাবাবু আর দাদাবাবুদের ডেকে আন। ডাক্তার ভদ্রকেও খবর দে। এ তো হয়ে গেছে দেখছি।

পিসিমা মারা যাওয়াতে বাড়িতে কোনও হুলুস্থুল পড়ল না। চেঁচামেচি হল না। বাড়ির পুরুষরা একটু জোর পায়ে ফিরলেন। ডাক্তারবাবু নিঃশব্দে ওপরে উঠলেন এবং পনেরো মিনিটের মধ্যেই নেমে চলে গেলেন।

মৃত্যুসংবাদ পেয়েও পিসিমার ঘরে আমার না যাওয়াটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ দেখাচ্ছিল। কিন্তু তখন আমার ওপরে যাওয়ার সাধ্য ছিল না। বিছানায় পড়ে আমি গড়িয়ে কাঁদছিলাম।

সেই অবস্থায় আমার স্বামীই আমাকে এসে দেখলেন। খুব অবাক হয়ে বললেন, এ কী! এত কাঁদছ কেন? পিসিমার জন্য? এ তো আশ্চর্য কাণ্ড!

আশ্চর্য কাণ্ডই বটে। কারণ আমি ছাড়া বাড়ির আর কেউ কাঁদেনি। আর আমিও মোটেই পিসিমার শোকে কাঁদিনি। কেঁদেছি ভয়ে আর উদ্বেগে। এমন ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটল কেন আমার কপালে?

স্বামী খুব অবাক হলেন। বোধহয় তাঁর মনটাও নরম হল। তিনি ধরেই নিলেন যে আমি পিসিমার শোকে কাঁদছি। বললেন, পিসিমা গিয়ে একরকম ভালই হয়েছে। জীবনে ওঁর কী সুখ ছিল বলো তো! তিনতলার তিনখানা ঘর আগলে বসেছিলেন। দিনরাত গয়না ঘাঁটতেন। আর কোনওদিকে কোনও সুখ বা আনন্দ ছিল না। তুমি যে এত কাঁদছ, তোমার সঙ্গে পিসিমার এত ভাব হল কবে?

আমি জবাব দিতে পারলাম না। কিন্তু স্বামীকে দুহাতে আঁকড়ে বললাম, আপনি শ্মশানে যাবেন না। আমি একা থাকতে পারব না। আমার ভয় করছে।

উনি আমার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তোমার মনটা যে এত নরম তা জানতাম না তো! বেশ ভাল মেয়ে তুমি।

আমার শাশুড়ি আমাকে ডাকছিলেন, ও ছোটো বউমা! কোথায় গেলে? একবার এসো। এ সময়ে আসতে হয়।

ভজহরিও ডাকতে এল। আমাকে তাই তিনতলায় উঠতেই হল শেষ অবধি। স্বামী আমাকে ধরে ধরেই তুললেন। আমার কান্না দেখে সবাই অবাক।

শাশুড়ি বলেই ফেললেন, ওমা! অত কাঁদার কী?

জা কিছু বললেন না, কিন্তু তিনি যে আমাকে খুব তীক্ষ্ণচোখে নজর করছেন তা আমি টের পাচ্ছিলাম। উনি একটা বাক্স নিয়ে আমাকে নীচে নামতে দেখেছেন।

পিসিমাকে একটা মাদুরে শোয়ানো হয়েছে সিঁড়ির মুখে। শরিকরা সবাই ঝেঁটিয়ে এসেছেন। পাড়াপ্রতিবেশীদের ভিড় জমে গেছে। তবু মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার ভয়-ভয় করছিল। এই বুঝি পিসিমা পট করে আমার দিকে তাকাবেন।

বেশ একটু বেশি রাতেই শ্মশানযাত্রীরা রওনা হয়ে গেল। আমার স্বামী তামার অনুরোধ রাখলেন। নিজে গেলেন না। শরীর খারাপের অজুহাতে রয়ে গেলেন। কেউ তাতে কিছু মনেও করল না।

স্বামীকে ঘটনাটার কথা বলব কিনা তা আমি বুঝতে পারছিলাম না। উনি বিশ্বাস করবেন না। আমি নতুন বউ। আমার সম্পর্কে একটা অন্যরকম ধারণাও হতে পারে। আরও একটা ভয়, পিসিমা গয়নার বাক্সটা সাবধানে রক্ষা করতে বলেছেন। দ্বিতীয় কাউকে না জানানোই ভাল।

পিসিমার সৎকার হয়ে গেল। শ্মশানবন্ধুরা ফিরল। ভোর হল।

সকালে দোতলায় আমার জ্যাঠাশ্বশুরের ঘরে একটা পারিবারিক মিটিং বসল। সেই মিটিং-এ আমাকে ডাকা হয়নি। আমি দুরুদুরু বুকে নিজের ঘরে বসে রইলাম। আমার মন বলছিল, ওঁরা পিসিমার গয়নাগাঁটি এবং তিনতলার দখল কে নেবে তাই নিয়ে আলোচনা করছেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে টের পেলাম ওঁরা সবাই মিলে তিনতলায় উঠলেন।

আমি কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না পিসিমার চাবির গোছাটা আমি কোথায় ফেলে এসেছি। ফের যে আঁচলে বেঁধে রেখে আসিনি তা জানি।

ঘণ্টাখানেক বাদে আমার স্বামী থমথমে মুখে নেমে এলেন। তাঁর মুখ দেখে অজানা ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল। উনি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ বললেন, পিসিমার গয়নার বাক্স পাওয়া গেল না।

আমার বুকের ভিতরে বোধহয় হঠাৎ এক গেলাস রক্ত চলকে গেল। কাঁপা গলায় বললাম, গয়নার বাক্স?

হ্যাঁ। সোজা কথা নয়, একশ ভরি সোনা। তার মধ্যে পাকা গিনিই তো চল্লিশ পঞ্চাশটা হবে। পিসিমা বিয়েতে যৌতুক পেয়েছিলেন।

আমি অবাক হলাম। একশ ভরি সোনা তো কম ওজন নয়! আমি অত ভারী বাক্স নামিয়ে আনলাম কী করে?

স্বামী খুব চিন্তিত মুখে বললেন, বউদি অদ্ভুত কথা বলছে। বউদি বলছে গয়নার বাক্স কে নিয়েছে তা নাকি জানে। তবে নাম বলছে না। বাবা শুনে বলছে, এ নাকি নন্দ ঘোষালের কাজ। সে-ই তো যেত বেশি পিসিমার ঘরে।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না না। নন্দ ঘোষাল তো পুরোনো লোক।

সেটাই তো কথা। নন্দ ঘোষাল চুরি-টুরি করেনি কখনও।

আমি বিনীতভাবে বললাম, আপনি পিসিমার গয়না নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ওতে আমাদের কী দরকার?

আমার স্বামী আমার দিকে বিস্মিত চোখে চেয়ে থেকে বললেন, তোমার সোনাদানার ওপর লোভ নেই?

আমি কথা খুঁজে পেলাম। বললাম, লোভ ছাড়া মানুষ নেই। সাধুসন্ত গেরস্থ সবারই কম-বেশি লোভ থাকবেই। স্বয়ং ভগবানই মানুষের ভক্তির ওপর লোভ করেন।

আমার স্বামী অকপট শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার দিকে তাকালেন। তিনি আমাকে আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। বললেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু বাক্সটা যাবে কোথায়?

তা নিয়ে অন্যরা মাথা ঘামাক। আমার মনে হয় পিসিমার গয়নার সঙ্গে তাঁর আত্মার দীর্ঘশ্বাস মিশে থাকবে। আমাদের ও গয়নার দরকার নেই।

আমার স্বামী এ কথাটাও যেন মেনে নিলেন। তারপর বললেন, মা বলছেন তিনতলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আমরা যেন ওপরে চলে যাই।

আমি চমকে উঠে বললাম, কেন? আমরা তো এখানে বেশ আছি।

কোথায় বেশ আছি? নীচের তলাটা অন্ধকার, মশামাছির উৎপাতও বেশি। তিনতলায় কত আলোবাতাস। জায়গাও অনেক বেশি। তিনতলায় দাদা-বউদি যাবে না। বাবার হার্ট ভাল নয় বলে মা-বাবাও একতলা ছাড়বেন না। জ্যাঠামশাই একা মানুষ, তাঁরও দরকার নেই। আমরা না গেলে ওটা ফাঁকা পড়ে থাকবে।

থাকুক। ওখানে থাকতে আমার ভয় করবে।

আমার স্বামী হাসলেন। হাসলে তাঁকে খুবই সুন্দর দেখায়। আমি তাঁর মুখের দিকে খানিকক্ষণ মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকলাম। তিনি বললেন, মৃত মানুষের কিছুই তো থাকে না। তবে ভয় কিসের?

আমি বললাম, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। তবে আমার মনে হয় মানুষ মরে গেলেও তার কিছু ভাব থেকে যায়। আপনি আমাকে তিনতলায় থাকতে বলবেন না।

স্বামী দুঃখিতস্বরে বললেন, কিন্তু পিসিমা মারা গেলে তিনতলায় গিয়ে থাকব এ ইচ্ছে যে আমার বহুদিনের।

আমি করুণ কান্না-ভেজা গলায় বললাম, কিন্তু আমাদের তো এখানেই বেশ চলে যাচ্ছে। তাই না, বলুন!

উনি আর জোর করলেন না।

বাড়িতে ওদিকে গয়নার বাক্স নিয়ে তুমুল একটা আলোচনা আর তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছে। তাতে আমি আমার জায়ের গলা না পেয়ে একটু চিন্তিত হলাম। আমার জ্যাঠাশ্বশুর পুলিশে যাওয়ার কথাও বললেন।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমার জা ভজহরিকে দিয়ে আমাকে ছাদে ডেকে পাঠালেন। সেটা হেমন্তকাল, কিন্তু ছাদে খুব রোদ ছিল তা মনে আছে।

জা আমার দিকে সোজা চোখে চেয়ে বললেন, গয়নাগুলো পাচার করে দাওনি তো!

আমি মৃদুস্বরে বললাম, একথা কেন বলছেন?

তুমি খুব সোজা মেয়ে নও। পিসিমাকে গলা টিপে তুমিই মারোনি তো! তোমার সম্পর্কে এখন থেকে সাবধান হতে হবে। কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড।

আমি চুপ করে রইলাম। আমার জা সুন্দরী নন, আবার অ-সুন্দরীও নন। একটু মোটা হয়ে গেছেন বলে তাঁর ফিগার বলতে কিছু নেই। মুখখানা ঢলঢলে। সেই মুখে নিষ্ঠুরতাও আছে। সেই নিষ্ঠুরতাটাই এবারে ফুটে উঠল। বললেন, আমি তোমার নাম কাউকে বলিনি। বলার দরকারও নেই। আমি জানি, পিসিমার একশ ভরির ওপর সোনা আছে।

আমি ন্যাকা সেজে বললাম, আমাকে কেন বলছেন?

ন্যাকা সেজো না। বেশি ন্যাকা সাজলে পুলিশে ধরিয়ে দেব। জ্যাঠামশাই খবরও দিচ্ছেন আজ থানায়। তোমাকে কোমরে দড়ি বেঁধে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে। চুরি আর খুনের দায়ে।

ভয় পেয়ে বললাম, আমি কিছু করিনি।

কী করেছ তা তোমার বাক্স-প্যাঁটরা খুললেই বোঝা যাবে, যদি না পাচার করে দিয়ে থাকো। তোমার মতো ভয়ঙ্কর মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি। তুমি সাঙ্ঘাতিক। ঠাকুরপোকেও একটু সাবধান করে দেওয়া উচিত।

আমার চোখ ভিজে এল। এ গল্প কাকেই বা বলা যায়? কে বিশ্বাস করবে?

জা বললেন, তোমার চোখের জল দেখে ভুলব তেমন পাত্রী পাওনি। শোনো, চুরিই যখন করেছ তখন আর অন্য উপায় নেই। আমি ও গয়নার অর্ধেক চাই। পুরো পঞ্চাশ ভরি। আমার বিশ্বাসী স্যাকরা আছে। সে এসে সমান ভাগ করে দেবে। কাকপক্ষীতেও জানবে না। কাল সন্ধেবেলায় সে আসবে। ও সময়ে কেউ বাড়ি থাকে না। আমার ঘরে ভাগাভাগি হবে। বুঝেছ?

আমি জবাব দিলাম না।

উনি খানিকক্ষণ জবাবের অপেক্ষা করে বললেন, সবটাই একা ভোগ করতে চাও?

রোদে তেতে ওঠা শানে দাঁড়িয়ে আমার পায়ে ফোস্কা পড়ার জোগাড়। উনি চটি পরে আছেন। আমার খালি পা। জ্বলুনি সইতে সইতে বললাম, আমি গরিব-ঘরের মেয়ে বলেই বোধহয় এই সন্দেহ আপনার!

সন্দেহের কোনও ব্যাপারই নয়। আমি দেখেছি। নিজের চোখে। তুমি শুধু গরিবের মেয়ে নও, তুমি ছোটলোকের মেয়ে। আমার কথায় যদি রাজি না হও তা হলে কিন্তু বিপদ আছে, জেনে রেখো।

আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। একবার মনে হল, বলে দিই। বললে একা একটা গোপন কথার ভার আর আমাকে বইতে হবে না। হয়তো জা বিশ্বাস করবেন না। না করলেই বা আমার কী?

হঠাৎ চোখে পড়ল, প্রকাণ্ড ছাদের আর এককোণে একজন সাদা থান পরা বিধবা দড়িতে একটা কাপড় যেন নেড়ে দিচ্ছেন। হঠাৎ তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

আমি অত গরমেও হিম হয়ে গেলাম। পিসিমা!

এই সময়ে শরিকদের ভাগের সিঁড়ি বেয়ে ওপাশ থেকে একটা মেয়ে চুল শুকোতে ছাদে এল। সে দিব্যি পিসিমার মুখোমুখি বসল, তাকালও। কিন্তু কোনও ভাবলক্ষণ দেখা গেল না। আমি বুঝলাম, মেয়েটা পিসিমাকে দেখতে পাচ্ছে না।

জা বললেন, ওরকম ফ্যাকাসে হয়ে গেলে কেন? ভয় পেয়েছ? ভয় পাওয়া ভাল। ভয় না পেলে কিন্তু সত্যিই বিপদে পড়বে। আর যদি ভাগাভাগি করে দাও তা হলে কোনও ভয় নেই। কাউকে বলব না।

আমি তাঁর দিকে চেয়ে বললাম, আমি কিছু জানি না। আপনি যা খুশি করতে পারেন।

বলে নেমে এলাম। পিসিমাকে দেখে বুক এত কাঁপছিল যে, ঘরে এসে আমার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। স্বামী রোজ দুপুরে ঘুমোন। আজও ঘুমোচ্ছন। জেগে থাকলে তিনি আমার অবস্থা দেখে খুবই অবাক হতেন।

আমি জানালার ধারে চুপ করে বসে রইলাম। খাঁ খাঁ দুপুরে একটা ঘুঘু ডাকছে। কাঁচা নর্দমার গন্ধ আসছে। আমার বুক উথাল-পাথাল করছে।

দুপুরটা এইভাবেই কেটে গেল।

বিকেল হল। স্বামী উঠলেন। আমি রান্নাঘরে তাঁর জন্য চা করতে গেছি, ঠিক এ সময়ে শুনতে পেলাম, দোতলার সিঁড়িতে দৌড় পায়ের আওয়াজ আর একটা চেঁচামেচি। আমার ভাসুর আমার স্বামীকে ডাকছেন। স্বামীও দৌড়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর ভজহরি বেরিয়ে ডাক্তার ভদ্রকে নিয়ে এল।

আমি চুপ করে সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভজহরি নীচে নেমে আসছিল, আমাকে দেখে বলল, বউদি! সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। বড় বউদির জপ বন্ধ হয়ে গেছে।

জপ বন্ধ! তার মানে কী?

কথা বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুই বলতে পারছেন না। শুধু আঙুল তুলে কাকে দেখাচ্ছেন আর উঁ উঁ করছেন।

আমি একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লাম। কিন্তু আঙুল তুলে জা কাকে দেখাচ্ছেন?

বিকেলে কেউ বাড়ি থেকে বেরলেন না আজ। সকলের মুখ গম্ভীর। কাল এ বাড়িতে একটা মৃত্যু আর আজ একজনের কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবাই একটু বিহ্বল।

স্বামী এসে বললেন, লতা, তুমি একটু বউদিকে দেখে আসবে নাকি? কেন যে হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল!

আমি মৃদুস্বরে বললাম, উনি আমাকে পছন্দ করেন না। তবে আপনি বললে যাব।

আমি দোতলায় উঠে তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াতেই আমার জা শোয়া অবস্থা থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বসে পড়লেন, তারপর আমার দিকে আঙুল তুলে উঁ উঁ করে শব্দ করতে লাগলেন। বুঝলাম উনি গয়নার বাক্সের চোরকে চিনিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু সেটা কেউ বুঝতে পারছে না।

আমার ভাসুর চাতক মিত্র চমৎকার মানুষ। ইনি আমার স্বামীর চেয়েও বোধহয় সুপুরুষ। সুন্দর মুখখানায় দুশ্চিন্তা আর ভয়ের ছাপ পড়েছে। আমার দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে বললেন, কী হল বলল তো বউমা? ও এরকম করছে কেন?

আমি মৃদুস্বরে বললাম, হয়তো কিছু একটা বলতে চাইছেন।

কী বলতে চাইছে? তুমি বুঝতে পারছো?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। তবে উনি ভাল হয়ে উঠলে হয়তো বলতে পারবেন।

ডাক্তারও বুঝতে পারছেন না হঠাৎ কেন এরকম হল। জিবটা অসাড় হয়ে গেছে। সমস্ত শরীরের মধ্যে কারও শুধু জিবটা অসাড় হয়ে যায় এরকম কখনও শুনিনি।

আমার জা বড় বড় চোখ করে আমাকে দেখছেন আর স্বামীর দিকে ফিরে আমাকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন। আমি একটু একটু ভয় পাচ্ছিলাম।

আমার ভাসুর বড় নিরীহ শান্ত মানুষ। দাপুটে স্ত্রীর সামনে তিনি যেন সবসময়ে মিইয়ে থাকেন। ঘর থেকে বড় একটা বেরোন না। সন্ধের পর একটু আধটু আড্ডা মারতে যান। এ বাড়ির বেশিরভাগ পুরুষই নিষ্কর্মা, দিবানিদ্রাপরায়ণ, অলস মস্তিষ্ক। এঁরা বিপদে পড়লে ভীষণ ঘাবড়ে যান। অনভ্যাসে এঁদের বুদ্ধিসুদ্ধিরও তেমন ধার নেই। স্ত্রীর অসুখে আমার ভাসুর এতই ঘাবড়ে গেছেন যে, জায়ের ইঙ্গিত বা ইশারা বুঝতেই পারলেন না।

কিন্তু মুখ বন্ধ হলেও কথা বলার অন্য উপায় আছে। আমার জা তো কাগজে লিখেই সব তাঁর স্বামীকে জানাতে পারেন। হয়তো জিব আচমকা অসাড় হয়ে যাওয়ায় উত্তেজিত মাথায় বুদ্ধিটা খেলছে না। কিন্তু কিছু পরেই নিশ্চয়ই কথাটা খেয়াল হবে। তখন আমার বিপদ আছে।

হঠাৎ আমার ভাসুর টেবিল থেকে একটা কাগজ তুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা দেখো। কিছু বুঝতে পারছো?

একসারসাইজ খাতার একটা রুলটানা পাতা। তাতে একটা অক্ষর লেখা গ। আর তারপর থেকে সব হিজিবিজি আঁকিবুকি।

আমার ভাসুর বললেন, ও একটা কোনও জরুরি কথা বলতে চাইছে। লিখতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। শুধু গ অক্ষরটা পড়া যাচ্ছে।

উনি বুঝতে না পারলেও ওই গ অক্ষরটা আমি খুব বুঝতে পারছি। বললাম, ওঁর হাতও কি অসাড়?

না তো? হাতে তো কিছু হয়নি। কিন্তু লিখতে পারছে না।

আমি মুখে দুঃখের ভাব ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দুঃখ যে আমার হচ্ছিল না তাও নয়। আসলে দুঃখের চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে আমার ভয়। এসব কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে তা আমি জানি না। কিন্তু হচ্ছে।

আমার ভাসুর বললেন, তুমি একটু ওর কাছে বসে থাকো। আমি ওষুধ কিনে আনতে যাচ্ছি।

ভাসুরের এ কথায় আমার জা যেন হঠাৎ ভয়ঙ্কর ভীত আর উত্তেজিত হয়ে উঁ উঁ উঁ উঁ করতে লাগলেন। মনে হল, উনি ভাসুরকে যেতে বারণ করছেন। ভাসুর ওঁর দিকে চেয়ে বললেন, কোনও চিন্তা নেই, লতা আছে। আমি এখনও আসছি।

ভাসুর বেরিয়ে গেলেন।

উনি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি আমার জায়ের মুখে যে আতঙ্ক ফুটে উঠতে দেখলাম সেরকম দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। ওঁর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে পড়ল, মুখ হাঁ, ঘন ঘন শ্বাস। আমি তাড়াতাড়ি ওঁর কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বললাম, ওরকম করছেন কেন দিদি? সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের কিচ্ছু নেই।

উনি যেন ভয়ে গুটলি পাকিয়ে গেলেন। পিছু হটে খাটের রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে হঠাৎ আর্তস্বরে বলে উঠলেন, আমাকে মেরো না! আমাকে মেরো গয়নার কথা আমি কাউকে বলব না। কালীর দিব্যি! আমি ওর

ভাগ চাই তুমি মন্ত্রতন্ত্র জানো, বাণ মেরে আমার জিব: অসাড় করে দিয়েছে। আমি এই কান মলছি, নাক মলছি, কখনও যদি আর কিছু বলি! তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে ছেড়ে দাও..

বোবার মুখে কথা ফুটতে দেখে আমার বুদ্ধি আবার গুলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ মানুষটার দিকে বিহ্বল চোখে চেয়ে রইলাম। জা হাউ হাউ করে কাঁদছেন। আমার দিকে হাতজোড় করে চেয়ে আছেন। হাত দুখানা থরথর করে কাঁপছে। মুখ ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে আর লালায়। এত কষ্ট হচ্ছিল! আমি ঠিকে ঝি পরেশের মাকে ডেকে ওঁর কাছে থাকতে বলে ঘরে চলে এলাম।

দুপুরবেলা পুলিশ এসে সকলের জবানবন্দী নিচ্ছিল। তাদের জেরার মুখে পড়ে ভজহরি কী একটা বলতে যাচ্ছিল আমতা আমতা করে। কিন্তু কেন যেন হঠাৎ ফ্যাকাসে মুখে চুপ করে গেল। সন্দেহবশে পুলিশ নন্দ ঘোষাল আর ভজহরিকে ধরে নিয়ে গেল।

আমার শ্বশুর, শাশুড়ি, জ্যাঠাশ্বশুর ভাসুর আর স্বামী চুরি-যাওয়া গয়না নিয়ে নানারকম আলোচনা গবেষণা করতে লাগলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম, পিসিমার গয়নার ওপর এ পরিবারের একটা প্রত্যাশা ছিল। হয়তো বা এ পরিবারের নিঃশেষিত সোনাদানার ভাণ্ডারে ওই গয়না কিছু প্রাণ সঞ্চার করতে পারত। পুরুষেরা সোনা বেচে আরও কিছুদিন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খেতেন।

আমি গরিব ঘরের মেয়ে। একশ ভরি সোনা আমার স্বপ্নেরও অগোচর। এই সোনার ভার আমি বইব কী করে? কয়েকটা দিন আমার অস্থিরতা এমন বাড়ল যে, পাগল-পাগল লাগত। কী করব বুঝতে পারি না। গোপন কথার একজন ভাগীদার থাকলে বেশ হয়। কিন্তু আমার গোপন কথাটাও এতই বিপজ্জনক যে কাউকে বলতে সাহস হয় না।

নন্দ ঘোষাল না থাকায় আমাকেই রান্না করতে হয়। জা অসুস্থ, ঘর থেকে বেরোন না। শাশুড়ির বয়স হয়েছে। কাজের লোকও পাওয়া যাচ্ছে না। রাঁধতে পেরে আমি বেঁচেছি। একটা কাজ তো! কিছুক্ষণ সময় কাটে, অন্যমনস্ক থাকা যায়।

একদিন সন্ধেবেলা কষে মাংস রাঁধছি! আমার রান্নার হাত ভাল। যে খায় সেই প্রশংসা করে। গরম মশলা থেঁতো করতে শিল পাটা পেতেছি, এমন সময় দেখি, কপাটের আড়াল থেকে সাদা থান একটু বেরিয়ে আছে। কে যেন কপাটের আড়ালে দাঁড়ানো। এ বাড়িতে বিধবা তো কেউ নেই! আমি হিম হয়ে গেলাম ভয়ে। হাত পা কাঠ।

আড়াল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এল। পিসিমার নির্ভুল গলা শুনতে পেলাম। একটু চাপা, মাংস রাঁধছিস?

বুক ধড়ধড় করছে। তবু অভিজ্ঞতাটা একেবারে নতুন নয় বলে কোনও রকমে বললাম, হাঁ।

বেশ গন্ধটা বেরিয়েছে তো!

আমি চুপ করে বসে রইলাম।

কতকাল খাইনি। স্বাদই ভুলে গেছি। ভাল রাঁধিস বুঝি?

কী জানি! কাঁপা গলায় বললাম।

বেশ হবে খেতে। কিন্তু নুন দিতে ভুলে গেছিস যে! ভাল করে নুন দে।

থানটা সরে গেল। রান্নাঘর থেকে দৌড়ে শোওয়ার ঘরে পালানোর একটা ইচ্ছে আমার হয়েছিল। কিন্তু জোর করে নিজেকে শক্ত রাখলাম। কারণ, এই ভবিতব্য নিয়েই বোধহয় আমাকে বাঁচতে হবে। মাংসে নুন দিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছিল, একবার যেন দিয়েছি আগে।

সেই রাতে প্রত্যেকেই খেতে গিয়ে বলল, মাংসটা খুবই ভাল রান্না হয়েছিল, কিন্তু নুন বড্ড বেশি হয়ে গেছে। কেউ খেতে পারল না। এত রাগ হল!

রাতে আমি আমার স্বামীকে বললাম, আচ্ছা আপনি কি ভূতে বিশ্বাস করেন?

উনি কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না তো! কেন?

ও কিছু নয়।

॥ বসন ॥

বনভোজনের পর সন্ধেবেলা মস্ত চাঁদ উঠল পাহাড়ের মাথায়। এত বড় চাঁদ আমরা কেউ কখনও দেখিনি। চারদিকে পাহাড়, জঙ্গল, নদী, নুড়িপাথর আর বালিয়াড়ি সব যেন রূপকথায় ডুব দিয়ে নতুন রূপ ধরে ভেসে উঠল। কী সুন্দর যে হল সন্ধেটা! আমাদের অনেকের গলায় গুনগুন করে উঠল গান। প্রথমে গুনগুন, তারপর জোরে, তারপর চেঁচিয়ে কোরাস।

লরিতে আমাদের ডেগ, কড়াই, হাতখুন্তি তোলা হচ্ছে। রান্নার লোক আর যোগালিরা ওসব কাজ করছে। এখনও ফিরতে একটু দেরি আছে আমাদের। আমরা মেয়েরা হাত ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিলাম।

দিদিমণিরা চেঁচিয়ে বলছিলেন, বেশি দূর যেও না তোমরা। আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা রওনা হব।

কে কার কথা শোনে! এই সন্ধেটা কি আর ফিরবে? এমন জ্যোৎস্না, এমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে কে গিয়ে ঘুপচির মধ্যে ঢুকতে চায় বাবা?

একসঙ্গে সকলের থাকা হয় না। বড় দল ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যায়। এটাই নিয়ম। আমরাও ভাগ হয়ে ভাগে পড়লাম চারজন। পাহাড়ি নদীর ধার দিয়ে দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেলাম আমরা। দিনের বেলাতেও হেঁটেছি। কিন্তু তখন জ্যোৎস্না ছিল না, জলে ছিল না চাঁদের ছায়া, তখন ছিল এমন রূপকথার মতো জগৎ।

বড় বড় পাথরের টুকরো নদীর মধ্যে ছড়ানো। একটা ছিপছিপে নদী কত পাহাড় ভেঙে পাথর বয়ে এনেছে এই অবধি। এখন শীতের টানে তত স্রোত নেই। কী ঠাণ্ডা আর স্ফটিকের মতো পরিষ্কার জল!

আমরা চারজন দুটো পাথরের ওপর ভাগ হয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ গলা মিলিয়ে গাইলাম আমরা, চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে... ও চাঁদ চোখের জলে... চাঁদ নিয়ে আর গান মনে পড়ছিল না। গলা মিলছে না, গানের কথা ভুল হচ্ছে। আমরা 'ধ্যাত্তেরি' বলে হেসে উঠলাম।

আমার পাশে প্রীতি। অন্য পাথরটায় সুপ্রিয়া আর সীমন্তিনী। বসে বসে আমরা বকবক করতে লাগলাম।

খুব শীত। থম ধরে থাকা শীত তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু উত্তুরে হাওয়া দিলে হাড় অবধি কাঁপিয়ে দেয়। সন্ধের পর সেই হিমেল হাওয়াটা ছেড়েছে। কার্ডিগান আর স্কার্ফ ভেদ করে হাওয়া আমাদের ঝাঁঝরা করে ঢুকে যাচ্ছে শরীরের ভিতরে। আমি তো পেটের মধ্যে অবধি ঠাণ্ডা টের পাচ্ছিলাম। আজ রাতেই আমার সর্দি হবে। নাক সুরসুর করছে। জ্বরও হতে পারে। হোক গে। কী ভাল লাগছে বসে থাকতে!

নিজেদের অজান্তেই আমরা চারজন আবার দুজন দুজন করে ভাগ হয়েছি। কথা হচ্ছিল চারজনের সঙ্গে চারজনের। এখন হচ্ছে প্রীতিতে আমাতে। সুপ্রিয়া আর সীমন্তিনীতে।

প্রীতির সঙ্গে কথা বলে সুখ নেই। কোনও না কোনওভাবে ও ওর নীতীশের কথা এনে ফেলবেই। নীতীশ ওর হবু বর। পাঁচ বছর ধরে প্রেম করার পর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এখন ওর মুখে কেবল নীতীশ আর

নীতীশ। নীতীশ ওকে একটা সেন্ট দিয়েছে, বিয়ের পর নীতীশ ওকে কাশ্মীর নিয়ে যাবে, নীতীশ চাকরিতে একটা প্রমোশন পেয়ে ওকে বলেছে, তুমি ভীষণ পয়া... এইসব। ওর নীতীশকে আমরা ভালই চিনি। এমন কিছু নয়। কিন্তু ও এমন বলবে যেন নীতীশের মতো আর কেউ হয় না।

পুরুষ মানুষদের মেয়েরা কি পছন্দ করে? এ কথাটার জবাব কোনও মেয়ে কি দিতে পারে? যদিও কলেজের মেয়েরা আলাদা করে বনভোজন করি, কিন্তু আমাদের কলেজটা কো-এডুকেশন। একবার বনভোজনে ছেলেরা খুব অসভ্যতা করেছিল বলে এখন আর একসঙ্গে পিকনিক হয় না। ছেলেদের হ্যাংলামির জন্য বনভোজনের আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়। শুধু বনভোজন, রোজ কলেজেই কি কিছু কম ব্যাপার হয়? মেয়েদের নজরে পড়ার জন্য, হীরো হওয়ার জন্য ছেলেরা কত কীই না করে! কেউ কেউ তো পাউডার মেখেও আসে। যার স্বাস্থ্য ভাল সে মাসল ফুলিয়ে বেড়ায়। মেয়েদের কমনরুমে আমরা সেসব নিয়ে হেসে গড়াই।

নীতীশের কথা ফেঁদে বসার জন্য প্রীতি উসখুস করছিল। হঠাৎ বলল, জানিস বসন,...।

আমি বুঝলাম এবার নীতীশের কথা আসছে।

আমি দুম করে জিজ্ঞেস করলাম, তোদের বিয়ে কবে যেন!

প্রীতি বলল, বিয়ে! সে বৈশাখের আগে নয়। আষাঢ়ও হতে পারে। ওর তো ছুটিই নেই। প্রমোশন পাওয়ার পর যা কাজ বেড়েছে। আর ওকে ছাড়া অফিস অন্ধকার। ম্যানেজার তো বলেইছে, নীতীশ, তুমি না থাকলে অফিস অচল।

বিয়ের পরও কি তুই পড়াশুনো চালিয়ে যাবি?

ও মা, চালিয়ে যাব না! আমার শ্বশুর আর শাশুড়ি তো বলেই দিয়েছে, বউমা, যত পারো কোয়ালিফিকেশন বাড়াও। সংসারের কিছুই তোমাকে করতে হবে না। শেখো, জানো, বড় হও।

আমার খুব হাসি পেল। প্রীতি খুব সাধারণ ছাত্রী। ওর কোয়ালিফিকেশন খুব বেশি বাড়বার কথা নয়। আর প্রীতি হল সংসারী টাইপের। বিয়ের পরই ও এমন মজে যাবে সংসারে যে, পড়াশুনোর কথা ওর মনেই পড়বে না।

প্রীতি তার নীতীশের কথা শুরু করে দিল। আমি চারদিকে জ্যোৎস্নার অপার্থিব আলোয় কোন অচেনা জগতে চলে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে প্রীতির ছেঁড়া ছেঁড়া কথা কানে আসছিল, নীতীশকে তো জানিস, কেমন অনেস্ট আর আপরাইট... ও তো বলে, তুমি আমার গাইডিং কোর্স... ওরা কিচ্ছু চায় না রে, এমন কী ঘড়ি-আংটি অবধি নেবে না বলেছে... টাকাপয়সা একদম চেনে না নীতীশ, সব আমাকে সামলাতে হবে...

কোনও পুরুষের প্রতি আমার কেন এরকম আকর্ষণ নেই?

আজ যখন আমরা এক দঙ্গল মেয়ে পিকনিকে আসছিলাম, তখন একটা জিপ গাড়িতে কয়েকটা অবাঙালি ছেলে অনেক দূর পর্যন্ত আমাদের পিছু নিয়েছিল। দিদিমণিরা বারণ করলেন, যেন আমরা ওদের দিকে না তাকাই। ছেলেগুলো শিস দিয়ে, হিন্দি গান গেয়ে, হাতের মুদ্রায় অনেক ইশারা ইঙ্গিত করেছে। মেয়েরা সবাই তাই দেখে কী হাসাহাসি, ঢলাঢলি! শুধু আমারই রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল।

আমার পিসতুতো দাদার কলিগ এক ইনজিনিয়ার সবে এ শহরে এসেছে বদলি হয়ে। কয়েকদিনের মাত্র পরিচয়। মাসখানেক আগে লোকটা এক সন্ধেবেলায় আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ফ্রি আছেন?

ছেলেদের হাড়ে হাড়ে চিনি। গলার স্বর শুনেই বুঝলাম, হৃদয়ঘটিত ব্যাপার। বেশ কড়া গলায় বললাম, তার মানে?

লোকটা বেশ স্মার্ট। একটু হেসে বলল, মানে এগোনো যাবে কিনা। কোনও চান্স দেবেন কি?

আমি বললাম, আমি ফ্রি আছি, আর এরকমই থাকতে চাই।

স্মার্ট লোকটা ঘাবড়াল না। অপমানটা হজম করে বলল, থ্যাংক ইউ।

সেইখানেই সম্পর্কটা শেষ।

পর্যায়ক্রমে দুজন অধ্যাপক এবং একজন ডাক্তারও আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। সরাসরি আমাকে নয়, আমার বাবার মারফত। আমার বাবা বলেছেন, মেয়েকে বলে দেখি।

আমি নাকচ করে দিয়েছি।

পুরুষ জাতটাকে যে আমি কেন বিশ্বাস করতে পারি না তা আমার আজও বুঝে ওঠা হল না।

আমি পাথর থেকে নেমে পড়ে বললাম, একটু ঘুরি। বসে থেকে ভাল লাগছে না।

এবার আমি দলছুট। একা। ওরা কেউ এল না।

দিদিমণিদের একজন মণিকাদির সরু গলা পাচ্ছি, মেয়েরা, তোমরা চলে এসো। লরিওলা আর দেরি করতে রাজি নয়। রাত দশটা অবধি কন্ট্রাক্ট।

জানি, সবকিছুরই একটা বাধ্যবাধকতা আছে। এই যে মুক্তি, ছুটি, জ্যোৎস্নায় অপরূপ প্রকৃতির মধ্যে স্বপ্নময় পদচারণা এ থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। তেমনি একদিন সিঁথিমৌর পরে, গয়নায় শাড়িতে চন্দনের ফোঁটায় সেজে বসতে হবে বিয়ের পিড়িতে।

নারী ও পুরুষ নাকি পরস্পরের পরিপূরক। আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, পুরুষকে ছাড়াই আমার চলে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে আমি অনেকটা দূর চলে আসি। নিঃসঙ্গতাই আমার হাত ধরে থাকে। পাশাপাশি হাঁটে আমার সঙ্গে। নিঃসঙ্গতাই আমার প্রিয় বন্ধু।

আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই স্কুলে যেত অমলেশ। লম্বা রোগা চেহারা, জামার বোতাম গলা অবধি আটকানো, পরনে মোটা ধুতি, মাথায় চুল পাট করে আঁচড়াননা। কোনওদিকে তাকাত না, সোজা হেঁটে যেত। আমাদের তিনটে বাড়ির তফাতে তার বাড়ি। টিনের চাল আর বাঁশের বেড়ার ঘর। তার বাবা মাইনর স্কুলের মাস্টারমশাই। কখনও জামা গায়ে দিতেন না, খালি গায়ে একটা উড়নি জড়িয়ে সর্বত্র যেতেন। অমলেশের মা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন চাল, তেল, নুন বা চিনি ধার করতে। তাঁর মুখেই শুনতাম অমলেশ প্রায়ই না-খেয়ে স্কুলে যায়, কারণ ঘরে চাল বাড়ন্ত হয় মাঝে মাঝে। তিনি দুঃখ করে বলতেন, ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল, কিন্তু তেমন করে খেতে দিতে পারি কই! কচুঘেঁচু খেয়ে আর কতদূর কী করবে?

অমলেশ স্কুলের ভাল ছাত্র। কিন্তু শুধুই ভাল ছাত্র। তার সারাক্ষণের সঙ্গী। কেবল বই। সে ফুটবল মাঠের পাশ দিয়ে নির্বিকার হেঁটে চলে যেত, একবার ফিরেও তাকাত না খেলার দিকে। সে সিনেমা দেখত না, আড্ডা মারত না, শুধু দেদার নম্বর পেয়ে ফাস্ট হয়ে এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে উঠত। সবাই বলত, গুড বয়। ভেরি গুড বয়।

আমি ছোটোবেলা থেকে তাকে দেখে আসছি। একইরকম পোশাক। একইরকম আঁচড়ানো চুল। কোনওদিন ফুলহাতা শার্টের হাতদুটো গুটিয়ে পরতে দেখিনি তাকে।

আমি তখন খুবই ছোটো, ছ সাত বা আট বছর বয়স, তখন অমলেশ এইট নাইনের ছাত্র। বয়সের তুলনায় খুব গম্ভীর। সে কারও বাড়িতে যেত না। তবে তার দুটো বোন আর একটা ছোট ভাই আমাদের বাড়িতে বহুবার সত্যনারায়ণ পুজোর সিন্নি বা হরির লুটের বাতাসা খেয়ে গেছে। আমাদের পুরোনো জামাকাপড় মা তাদের দিয়ে দিত, তারা সেসব পরে দিব্যি বেড়াত। শুধু অমলেশদাই ছিল অন্যরকম। যেন কারও সঙ্গেই তার কোনও সম্পর্ক নেই। এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ উদাস ও পথভ্রষ্ট হয়ে সে এসে পড়েছে।

মনে আছে, একদিন অমলেশদা যাচ্ছে, পাড়ার ছেলেরা টেনিস বল দিয়ে ফুটবল খেলছে রাস্তার পাশে। কাদামাখা সেই বলটা হঠাৎ দুম করে এসে অমলেশদার সাদা জামার বুকে লাগল। অন্য কেউ হলে দাঁড়াত, বিরক্ত হত, একটু বকাঝকাও করত। কিন্তু অমলেশদা এক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে জামায় বলের দাগটা মাথা নিচু করে একবার দেখল। তারপর চুপচাপ চলে গেল।

অমলেশদা যেবার স্কুলের শেষ পরীক্ষায় গোটা পশ্চিম বাংলায় নাইনথ স্ট্যান্ড করে পাশ করল তখনও আমি ফ্রক পরি। অমলেশদার মা এসে আমার মাকে বললেন, কলকাতার বড় কলেজে পড়তে ডাকছে অমলকে। তা সে কি আর আমাদের কপালে হবে! অত খরচ।

গোটা শহরে খবরটা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ হল। এই ছোট শহর থেকে কেউ সচরাচর এমন কৃতিত্বের পরিচয় দেয় না। স্কুলে আর টাউন হলে দুটো সভা হল অমলেশদাকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য। টাউনহলের সভায় আমি আর দুজন মেয়ের সঙ্গে উদ্বোধনী সংগীত গেয়েছিলাম। অমলেশদার কপালে চন্দনের ফোঁটা পরানো আর গলায় মালা দেওয়ার ভার পড়ল আমার ওপর। অমলেশদার কপালে ফোঁটা দিতে অনেকটা ঝুঁকতে হয়েছিল। লজ্জায় মাথা নত করে ছিল অমলেশদা। মালাটা গলায় দিতে না দিতেই খুলে পাশে সরিয়ে রাখল। মুখে চোখে কৃতিত্বের কোনও দীপ্তি বা অহংকার নেই। যেন নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচে।

অমলেশদার কলকাতার কলেজে পড়তে যাওয়া হল না। এ শহরের কলেজেই ভর্তি হল। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই যেত আগের মতো। পরিবর্তনের মধ্যে একটু লম্বা হল, সামান্য গোঁফ দাড়ির আভাস দেখা দিল। পরের পরীক্ষায় আবার দারুণ রেজাল্ট। শহরে আবার হৈ-চৈ।

অমলেশদার বোন সুমিতাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতাম, হ্যাঁ রে, অমলেশদা বই ছাড়া আর বুঝি কিছু চেনে না?

না। ওর শুধু বই।

তোদের সঙ্গে গল্প করে না?

খুব কম। যা ভয় পাই দাদাকে! যখন আমাদের পড়ায় তখন সারাক্ষণ বুক দুরদুর করে।

খুব বকে বুঝি?

না না, একদম বকে না। কিন্তু এমন করে ঠাণ্ডা চোখে তাকায় যে তাতেই আমাদের হয়ে যায়। ভীষণ কম কথা বলে তো। যা কথা সব মায়ের সঙ্গে।

অমলেশদা সম্পর্কে আমার কেন জানি না, খুব জানতে ইচ্ছে করত। গম্ভীর লোকটা আসলে কেমন, রাগী না রসকষ আছে, কাঠের পুতুল না রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু ওদের বাড়িতে যাওয়া আমাদের বিশেষ হয়ে

উঠত না। ওদের ঘরে বসবার জায়গা নেই। কেউ গেলে ওরা এমন ছোটাছুটি করত, দোকানে যেত ধারে মিষ্টি আনতে বা চায়ের চিনি জোগাড় করতে যে আমাদের অস্বস্তিতে পড়তে হত। হতদরিদ্র বলেই বোধহয় অতিথি এলে ওরা আপ্যায়ন করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ত। এ জন্য মা বলত, যাওয়ার দরকার কী?

অমলেশদার তিন ভাই বোন অমিতা, সুমিতা, অলকেশ সবাই নিজের নিজের ক্লাসের ফাস্ট গার্ল বা বয়। কিন্তু কেউ অমলেশদার মতো মুখচোরা আর বই-সর্বস্ব নয়। অলকেশ ভাল ফুটবল আর ব্যাডমিন্টন খেলত। সুমিতা আর অমিতা গান গাইত, সেলাই ফোঁড়াই করত।

তখন আমার বয়ঃসন্ধি উঁকি ঝুঁকি মারছে। আনচান করে মন, শরীর। প্রথম ঋতুদর্শন বয়ে আনল ভয় ও শিহরণ। জীবনের অজানা সব জানালা দরজা হাট করে খুলে দিল কে। শরীরে লজ্জাজনক নানারকম পরিবর্তন ঘটে যায়, বদলে যায় বাইরের পৃথিবীও।

সেই সময়ে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বোকার মতো কাজটা করে ফেলি। সেই লজ্জা আজও আমাকে কুঁকড়ে রাখে। আমি অমলেশদাকে একটা চিঠি দিই। চিঠিতে তেমন দোষেরও কিছুই ছিল না। শুধু লিখেছিলাম, আমি আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই। আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।

চিঠির কোনও জবাব এল না।

আমি মাকে ধরলাম, মা, অমলেশদাকে বলো না আমাকে পড়াতে। অত ভাল ছাত্র।

মা আপত্তি করল না। কিন্তু খোঁজ নিয়ে বলল, না, ও টিউশনি করে না। খুব লাজুক ছেলে তো।

ব্যাপারটা সেখানেই মিটে যেতে পারত। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, অমলেশদা আমার চিঠি পায়নি।

কিন্তু তা নয়। একদিন সুমিতা আমাকে এসে বলল, হ্যাঁরে, কী অদ্ভুত কাণ্ড! দাদা কাল তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল আমাকে।

আমি ভীষণ চমকে উঠলাম, কী কথা?

জিজ্ঞেস করছিল তুই কে, কোন বাড়ির মেয়ে, এইসব।

বুকের মধ্যে কেমন করছিল আমার। ভয়, অনিশ্চয়তা, শিহরন। আমার চিঠির কথা অমলেশদা বলে দেয়নি তো ওকে? গলা প্রায় বুজে আসছিল। জিজ্ঞেস করলাম, আর কী বলছিল?

আচ্ছা, তুই কি দাদাকে কখনও মুখ ভেঙিয়েছিলি? বা আওয়াজ দিসনি তো!

কেন বল তো!

দাদার যেন একটু রাগ-রাগ ভাব দেখলাম। আমি ভাবলাম, এই রে, বসন হয়তো মুখটুখ ভেঙিয়েছে।

আমার বুকটা পাথর হয়ে গেল হঠাৎ। রেগে গেছে? রাগবে কেন? একটা মেয়ে ভাব করতে চাইলে এমন কী দোষ?

সুমিতা বলল, আমি অবশ্য বলেছি, বসন ভীষণ ভাল মেয়ে। লেখাপড়া, গান বাজনায় সব দিকে চৌখস। স্বভাবও শান্ত। কক্ষনো কোনও অসভ্যতা করে না।

পরদিন থেকে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে অমলেশদা আর যেত না। বাড়ির সামনে মস্ত মাঠ। সেটা ঘুরে অনেক দূর দিয়ে যেত।

আমার জগৎ-সংসার যেন চুরমার হয়ে গেল এই অপমানে। বয়ঃসন্ধির প্রথম রহস্যের ঘেরাটোপ যখন আমাকে ঘিরে ধরেছে, যখন আমার কল্পনার রাজ্যে হাজার রঙের আলোর খেলা, তখনই হঠাৎ এই নির্মম

অপমান যেন আমার উদ্ভিন্ন নারীত্বকেই ধিক্কার দিল। ভেঙে পড়ল আমার চারদিককার চেনা পৃথিবী। যেন বৈধব্যের দীর্ঘ বিষণ্ণতা ধীরে ধীরে উঠে এল পাতালপুরীর অন্ধকার থেকে।

অন্য মেয়ে হলে এ রকম হত না। এ বয়স তো উড়ে উড়ে বেড়ানোরই বয়স। চঞ্চল, মতিচ্ছন্ন, হাল্কা চলন হয় বয়ঃসন্ধিতে। তখন কাকে বাছব তা ঠিক করতেই হিমসিম খেতে হয়। অনেকের মনোযোগ পেতে ভাল লাগে। কিন্তু আমি তো অন্য মেয়ে নই, আমি বসন। আমি এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা নিয়েই জন্মেছি।

যদি কেউ আজও জিজ্ঞেস করে, তুমি কি অমলেশের প্রেমে পড়েছিলে? আমি বুকে হাত রেখে বলতে পারব না, হ্যাঁ। কারণ, সেটা সত্যি কথা বলা হবে না। তার সঙ্গে আমার জীবনে একটিও বাক্য বিনিময় হয়নি, চোখাচোখি অবধি না। অমলেশদা দেখতে সুন্দর নয়, স্বাস্থ্যবান নয়, স্মার্ট নয়, শুধু গুড বয়। মেয়েরা শুধুমাত্র গুড বয়ের প্রেমে কমই পড়ে। আমি শুধু ভাব করতে চেয়েছিলাম। কেন জানি না। কারও সঙ্গে ভাব করার একটা ইচ্ছে যখনই হয়েছিল তখন ওই মানুষটার কথাই আমার মনে হয়েছিল।

লোকটা আমার চিঠির জবাব দিল না। পথ বদল করল। রাগ করল আমার ওপর। আমার ওই বয়সে পুরুষ জাতটার ওপর বিতৃষ্ণা জাগিয়ে দিতে ওইটুকুই ছিল যথেষ্ট।

অমলেশদা স্কলারশিপ পেয়ে চলে গেল কলকাতায়। কিছুদিন পর বিদেশে কোথায় যেন। অমলেশদাদের ভাঙা ঘর পাকা হল। দোতলা উঠল। হতদরিদ্র পরিবারে দেখা দিল কিছু সচ্ছলতা। সুমিতা, অমিতা স্ট্যান্ড না করলেও টপাটপ ভাল রেজাল্ট করে স্কুলের গণ্ডি ডিঙোল। অলকেশ এবার পরীক্ষা দেবে। সবাই জানে সেও ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পাবেই। ওদের পরিবারের সঙ্গে এখনও আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠতা। আমার আর অমলেশদার মধ্যে কী হয়েছিল কেউ জানে না। আসলে কিছুই হয়নি এমন, যা চোখে পড়ার মতো।

অথচ আমার জীবনটাই পাল্টে দিল সেই নীরব, ঘটনাহীন ঘটনা।

নিঃসঙ্গতার হাত ধরে আমি জ্যোৎস্নায় হেঁটে হেঁটে অনেকটা চলে গেলাম। একা থাকতে আজকাল আমার বেশ লাগে। এই যে একটু বিষণ্ণতা, একটু মন খারাপ, অতীতের নানা অপমানের স্মৃতিতে একটু ভার হয়ে থাকা বুক, চাপা অভিমান, সামান্য হিংসের হুল— এসবই যেন আমার বেঁচে থাকার ঝালমুন। নইলে বড় আলুনি লাগত।

শীতের নদী বালিয়াড়ির মস্ত আঁচল বিছিয়ে রেখেছে। ফটফট করছে জ্যোৎস্না। এত আলো যে, ছুঁচ পড়লেও কুড়িয়ে নেওয়া যায়। নদীর বাঁকের মুখে আমি এসে দাঁড়ালাম। ওদিকে একটা নির্জন পাহাড়। স্তব্ধ, মৌন, স্থির। পায়ের কাছ দিয়ে নদী তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। জলের মধ্যে নুড়ি পাথর অবধি দেখা যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। আর চারদিককার জনহীন খাঁ খাঁ শূন্যতার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মনে হল, এই যে আমি এত একা, আমার জন্য যে পৃথিবীতে কোথাও কেউ অপেক্ষা করে নেই, আমাকে কেউ যে ভালবাসে না, এটাই আমার পক্ষে ভাল। খুব ভাল।

শোভনা দিদিমণির গলার স্বর বিপন্ন মানুষের আর্তনাদের মতো কানে এল, বসন! বসন! কোথায় গেলে তুমি, সবাই লরিতে উঠে পড়েছে! শিগগির এসো।

জ্যোৎস্না ও নির্জনতার কাছে, রূপকথার রাজ্যে আমার একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস রেখে ফিরে এলাম।

দিদিমণিরা খুব বকলেন, বড্ড ইররেসপনসিবল মেয়ে তুমি! কত রাত হয়েছে জানো! একজনের জন্য সকলের কত দেরি হয়ে গেল! তোমরা আজকালকার মেয়েরা কী যে হয়ে যাচ্ছ দিনকে দিন!

একা থাকতে আমার বেশ লাগে, আবার দঙ্গলেও খারাপ লাগে না। হাসি, খুনসুটি, গল্প করতে করতে একা-আমিকে ভুলেই যাই। আমি যেন দুটো মানুষ। হাঁচোড় পাঁচোড় করে শাড়ি সামলে উঁচু লরিতে উঠতে খুব হাসাহাসি হল। শতরঞ্জিতে বসলেন আমাদের সাতজন দিদিমণি, ডেগ কড়াই ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে মেয়েরা। লরির ডালায় বসলাম আটদশজন। সামনের দিকে কয়েকজন দাঁড়িয়ে রইল। বেশ ঠাসাঠাসিই হয়ে গেল। ডালায় বসতে দিদিমণিরা বারণ করায় কয়েকজন নেমে ওল্টানো ডেগ কড়াই আর বালতির ওপর বসে পড়ল। কড়াই আর বালতির হাতল থাকায় সেগুলো উপুড় করলে খাপে খাপে বসে না। লরির ঝাঁকুনিতে ঢকঢক করে নড়তে লাগল। আর তা নিয়ে হাসির ধুম।

খানিকক্ষণ হাসাহাসির পর আমরা আবার গান ধরলাম। লরি শহরের দিকে এগোচ্ছে। আমরা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত এক অপার্থিব উপত্যকা ছেড়ে চলেছি অপরিসর ঘরের দিকে, ঘুপচির দিকে। মানুষ যে কেন ঘরবাড়ি বানাতে শিখল! সেই আদ্যিকালে পাহাড়ে, গুহায়, গাছের তলায় থাকত মানুষ। বেশ ছিল সেটা। বহু জন্ম আগে আমিও হয়ত ছিলাম এক গুহা-মানবী। পাথর ছুঁড়ে শিকার করতাম, আগুনে ঝলসে খেয়ে নিতাম মাংস, পাহাড়-জঙ্গলে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতাম। বন্ধনহীন জীবন।

গানে গানে, গল্পে, ঠাট্টায় অর্ধেক পথ পেরিয়ে এলাম আমরা। শহরে পৌঁছতে রাত দশটা হয়ে যাবে, তারপর যে-যার বাড়ি ফেরা। কিন্তু সব লক্ষ্যেরই অনিশ্চয়তা থাকে। বন্দনা দিদিমণি যখন ঘড়ি দেখে শিখা দিদিমণিকে বললেন, "আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যাব, ঠিক তখনই লরিতে একটা হেঁচকি উঠতে লাগল।

লরির হেঁচকি তোলা দেখেও আমরা হাসাহাসি করতে লাগলাম।

শোভনাদি বিরক্ত হয়ে বললেন, উঃ, তোমাদের হাসির চোটে অস্থির হয়ে গেলাম। লরিটা এরকম করছে কেন? ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করো তো!

জিজ্ঞেস করতে হল না। লরি রাস্তার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার ক্লিনার নেমে বনেট খুলে আলো জ্বেলে কী যেন দেখতে লাগল।

মাধুরীদি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে ড্রাইভার?

ড্রাইভার জবাব দিল, টানছে না। তেলে ময়লা আসছে।

যাবে তো।

যাবে। ঠিক করে নিচ্ছি।

দেরি হবে না তো?

না না, পাঁচ মিনিট লাগবে। বসুন।

পাঁচ মিনিট গড়িয়ে পনেরো মিনিট। তারপর আধঘন্টা।

উদ্বিগ্ন দিদিমণিরা গলা বাড়িয়ে বললেন, কী হয়েছে বলবে তো! এতগুলো মেয়ে, আমাদের একটা রেসপনসিবিলিটি আছে। চলবে?

ড্রাইভার একটু অনিশ্চয়তার গলায় বলে, দেখছি দিদিমণি। সাকশনে গড়বড় করছে।

শোভনাদি রেগে গিয়ে বললেন, তোমরা যে কেন এত দায়িত্বহীন! একটা খারাপ লরি নিয়ে ট্রিপ দিলে? এখন কী হবে? কতটা পথ এখনও বাকি!

মেশিনের ব্যাপার দিদিমণি, কিছু কি বলা যায় আগে থেকে। গত সপ্তাহে ওভারহল করানো হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর বোঝা গেল, লরি বেশ ভালরকম গণ্ডগোলে পড়েছে। মেয়েদের হাসি বন্ধ হয়ে গেল। দিদিমণিরা রাগারাগি করতে লাগলেন।

ইন্দিরাদি বললেন, লরি যদি না চলে তাহলেও আমাদের তো ফিরতেই হবে। ড্রাইভার, তুমি অন্য কোনও লরি থামাও।

ক্লিনার ছেলেটা সেই চেষ্টাও করল। ছুটির দিন এবং বেশি রাতে খুব কম ট্রাকই যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা থামল। সেটা চায়ের বাক্সে বোঝাই। ট্রাকের ড্রাইভার নেমে এসে আমাদের ড্রাইভারকে খানিকক্ষণ সাহায্য করে ফের ট্রাক চালিয়ে চলে গেল। আর দুটো ট্রাক থামল না। একটা প্রাইভেট গাড়ি থামল। কিন্তু তাতে চারটে মাতাল। একজন মাতাল বলল, এত মেয়েছেলে কোথায় চালান যাচ্ছে ভাই? রাতের অন্ধকারে আবু ধাবি পাচার হচ্ছে নাকি?

আর একজন অল্প মাতাল তাকে ধমক দিয়ে বলল, যাঃ, সব ভদ্রলোকের মেয়ে দেখছিস না! পিকনিক পাটি।

তিন নম্বর মাতাল বলল, আরে ড্রাইভার সাহেব, ট্যাঙ্কের মুখ খুলে একটা পাঁইট ঢেলে দাও, লরি উড়ে যাবে।

মাতালরা দাঁড়াল না। তাদের ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

ঘণ্টা খানেক বাদে ড্রাইভার লরিতে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

স্টার্টারের শব্দ হুড়ম হুড়ম করে খানিকক্ষণ আমাদের ভরসা দিল মাত্র। লরি নড়ল না।

ইন্দিরাদি আর্তনাদ করে উঠলেন, দশটা যে এখানেই বেজে গেল! এখন কী হবে?

ড্রাইভার খুব লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল, ব্যাটারিটা ডাউন আছে।

শোভনা দিদিমণি বললেন, তাহলে কী হবে?

একটু ঠেলে দিলেই চলবে।

ঠেলবে কে?

দিদিমণিরা কি একটু হাত লাগাবেন? বেশি দরকার নেই। একটু ঠেললেই হবে।

শুনে আমরা হৈ-হৈ করে উঠলাম। কেন ঠেলতে পারব না? আমরা কি অবলা? দুপুরে আজ মাংস খাইনি? ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়তে লাগলাম আমরা। দিদিমণিরা নানারকম আপত্তির শব্দ করতে লাগলেন, এই সাবধান! লরি হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করলে কী হবে? লরি ঠেলা কি মেয়েদের কাজ?

কী জগদ্দল ভারী লরিটা! আমাদের ঠেলায় প্রথমে একটুও নড়ল না।

শিখাদি ওপর থেকে বললেন, দাঁড়াও, আমরাও নামছি। আর শোননা, সবাই মিলে একসঙ্গে ঠেলতে হবে। অত হেসো না তোমরা। হাসলে গায়ে জোর থাকে না।

শুনে আমরা আরও হাসতে লাগলাম।

দিদিমণিরা নেমে এলেন। ইন্দিরাদি বললেন, কুলিদের দেখোনি? কেমন হেঁইও হেঁইও করে রেল লাইনের স্লিপার লাগায়? দাঁড়াও, সবাই মিলে ওরকম কিছু করতে হবে।

এই বলে তিনি "খরবায়ু বয় বেগে" গানটার একটা লাইন ধরে ফেললেন, আমি কষে ধরি হাল, তুমি তুলে ধরে পাল, হেঁই মারো মারো টান, হেঁইও... হেঁইও... সবাই মিলে একসঙ্গে বলো হেঁইও...

বলব কী, হাসিতে পেট ফেটে যাচ্ছে।

শুক্লা বলল, আমরা তত টানছি না দিদিমণি, ঠেলছি।

ওই হল।

হাসলে সত্যিই গায়ের জোর থাকে না। আমরা এত হাসছি যে, লরিটা আমাদের ঠেলা টেরই পাচ্ছে না।

শেষ অবধি অবশ্য সকলের হাসি থামল। ঠেলার চোটে লরি একটু একটু এগোতে লাগল। স্টার্টারের ধাক্কায় চমকে চমকে উঠতে লাগল। ভু রু র রু ত... ভু র র র রু ত... তারপর হঠাৎ আমাদের সবাইকে ভীষণ অবাক করে দিয়ে ঘড়ঘড় করে স্টার্ট নিয়ে ফেলল। আমরা তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠলাম।

লরি ফের জঙ্গলের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল। লরির কানায় বেসামাল বসে আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছি। ফিরে যাচ্ছি কেন?

প্রীতি কখন আমার পাশে এসে বসেছে কে জানে। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, এই বসন, শোন, আমার বাঁ কানের রিংটা কোথায় খুলে পড়ল বল তো!

কী করে বলব?

হুকটা একটু লুজ ছিল। লরি ঠেলার সময় পড়ে গেছে বোধহয়। কী হবে এখন?

আমি বললাম, অত ভাবছিস কেন? আজকে এমন বনভোজন, এমন জ্যোৎস্না, তোর রিংটাকে এই জ্যোৎস্নার কাছে উৎসর্গ করে দে।

তুই ভীষণ অদ্ভুত আছিস! কী হবে এখন! মা যে খুব বকবে!

বকুক না। তোর নীতীশ তোকে কত গয়না দেবে।

প্রীতি রাগ করে বলে, হ্যাঁ দেবে। কত দেবে জানা আছে! মাকে গিয়ে যে কী বলব!

কানের একটা রিং-এর জন্য এই রাত্রিটা, এর এত জ্যোৎস্না, এত ঐশ্বর্য সব ব্যর্থ হয়ে গেল প্রীতির কাছে। মুখ গোমড়া করে বসে রইল পাশে। প্রীতির মতো মেয়েদের জন্য বোধহয় এ সব নয়। প্রীতির জন্য ঘুপচির ঘর, বশংবদ স্বামী, ভরা ভর্তি সংসার।

আর আমার জন্য? আমি তা জানি না।

কিছুক্ষণ পর আমার প্রীতির জন্য একটু মায়া হল। মুখটা বড্ড ভার করে বসে আছে। বললাম, শোন, তুই ভেবে নিতে পারিস না যে, দুলটা হারায়নি?

কী করে ভাবব? ওরকম ভাবা যায় নাকি?

কেন যাবে না? দুলটা যদি রাস্তায় পড়ে গিয়ে থাকে বা আর কোথাও, তাহলে সেখানেই পড়ে আছে। তাই না?

সেই তো!

তাহলে এক জায়গায় তো আছেই সেটা! তুই মনে কর তোর রিংটা ওখানে তুই-ই রেখে এসেছিস।

দূর! কী যে সব বলিস পাগলের মতো! কোনও মানে হয় না।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে একটু বকুনি শুনে শুয়ে পড়লাম। গভীর রাত অবধি ঘুম এল না। মাতাল-মাতাল লাগছিল নিজেকে। আমার ছোট কৌটোয় আজ অনেক আনন্দ ভরা হয়েছে। ঢাকনা বন্ধ হচ্ছে না। আমি ঘুমোবো কী করে? মা যেমন কখনও ঠোঙার চিনি কৌটোয় ঢালতে গিয়ে বিপদে পড়ে যায়, কৌটো উপচে যাচ্ছে, ঠোঙার চিনি তখনও ফুরোয়নি। কৌটো ঠুকে ঠুকে জায়গা করে ফের চিনির শেষটুকু সাবধানে ঢালে, তবু ফুরোয় না। কী জ্বালাতন তখন! আমার অবিকল সেই অবস্থা।

প্রীতি তার কানের একটা রিং হারিয়ে এসেছে। আর আমি! আমি তো আমার গোটা অস্তিত্বই ফেলে এসেছি ওই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত জনহীন উপত্যকায়। টের পাচ্ছি, আমি এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছি সেখানে। এলোচুল শ্লথ পা, গলায় একটু গানের গুনগুন, চারদিকে সোনার গুঁড়ো ঝরিয়ে দিচ্ছে মস্ত চাঁদ। নদীর জলে নুড়ি পাথরে ঢেউ ভাঙার মৃদু শব্দ। কী গহিন, কী গভীর স্বপ্নের মতো সুন্দর।

আমি যদি মরি ঠিক ভূত হব। পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন উপত্যকায় পাহাড়ে, জঙ্গলে, বালিয়াড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়াব। ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠব। বৃষ্টিতে ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজব। কিছুতেই মেয়ে হয়ে জন্মাব না আর।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, এই নিশুতরাতে চাটুজ্জে বাড়ির পাগল বউটা বেসুরো গলায় গান গাইছে, যত পারো পয়সা বাঁচাও, যত পারো পয়সা বাঁচাও... কচুপোড়া কাঁচকলা খাও, ডেঁড়েমুশে গতর খাটাও... যত পারো পয়সা বাঁচাও, যত পারো পয়সা বাঁচাও...

বিছানায় থাকতে পারলাম না। ওই বউটার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়। আমার ঘরের জানালার সোজাসুজি বউটার ঘর। কয়েক হাত মাত্র তফাত। চার বছর আগে বিয়ে হয়ে শ্রীময়ী যখন এল তখনই সবাই বলাবলি করেছিল, বউটার এবার হাড়ে কালি লাগবে। চাটুজ্জেরা কৃপণ এবং সেটা প্রায় বংশগত। দাদু কৃপণ ছিল, বাপ কৃপণ, ছেলে কৃপণ। চারু চাটুজ্জে উকিল। মক্কেলরা শুধু পয়সা দিয়ে পার পায় না, কার বাড়িতে কলাটা, কার বাড়িতে মুলোটা হয় সেসব খবর রাখে চারু চাটুজ্জে। দরকার হলে বাড়ি গিয়ে হানা দিয়ে নিয়ে আসে। চারু চাটুজ্জের রোজগার ভাল। ছেলে সুমিতও সরকারি অফিসার। ফ্যানশুদ্ধ ভাত, তরকারির খোসা, আটার ভুশি কিছু ফেলে না ওরা, সব খায়। বউটা ওই অসহ্য কৃপণতা সহ্য করতে পারেনি। পাগল হল, ছেলে হতে গিয়ে। পেটে বড়সড় বাচ্চা ছিল, নরমাল ডেলিভারি হচ্ছিল না। দিশি ধাই তখন ভয় পেয়ে বলেছিল ডাক্তার ডাকতে। সিজারিয়ান করাতে। শেষ অবধি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হাসপাতালে জায়গা ছিল না। এ শহরে বেশ কয়েকটা নার্সিং হোম আছে। কিন্তু চাটুজ্জেরা সেসব জায়গায় নেয়নি। টানাহ্যাঁচড়ার ধকলে শ্রীময়ী মরতে বসেছিল হাসপাতালের বারান্দায়। অবশেষে অল্পবয়সী একজন গায়নোকলজিস্ট সকালে রাউন্ডে এসে মেয়েটির অবস্থা দেখে নিজেই সিজারিয়ান ডেলিভারি করায় হাসপাতালে। বাচ্চাটা বাঁচেনি। শ্রীময়ী বেঁচে গেল। কিন্তু শ্বশুর আর স্বামীর কৃপণতায় সে এমন ধাক্কা খেয়েছিল আর সেইসঙ্গে সন্তানের শোক মিলে মাথাটা বিগড়ে গেল। এখন ওই গান গায়, হাসে, কাঁদে। আবার ঘরের কাজও করে।

আমি জানালাটা খুলে চাটুজ্জে বাড়ির দিকে চেয়ে রইলাম। ওপাশেও জানালা খোলা। শ্রীময়ী এলোচুলে এই ঠাণ্ডায় খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিল শ্রীময়ী। মামারা প্রচুর খরচ করে তার বিয়েটা দিয়ে দেয়। বছর দুই হল শ্রীময়ীর মা মারা গেছে। ওর এখন বাপের বাড়ি বলতেও কিছু নেই। মেয়েটা জ্বলছে, পুড়ছে, মরছে।

আমি মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে চেঁচিয়ে বলি, এই শ্রীময়ী, তুমি ও বাড়িটায় আগুন লাগাতে পারো না? চারদিকে কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দাও। পুড়ে মরুক সবাই।

মা শুনতে পেয়ে একদিন আমাকে বকেছিল। আমার ওপর চাটুজ্জেদের খুব রাগ। তাতে বয়েই গেল। শ্রীময়ী না লাগালে আমিই একদিন গিয়ে আগুন লাগিয়ে আসব।

আমি আস্তে করে ডাকলাম, এই শ্রীময়ী!

শ্রীময়ী গান থামাল। তারপর একটু চুপ থেকে বলল, কী বলছ?

ঘুমোওনি কেন? এত রাতে কেউ গান গায়?

শ্রীময়ী বলল, আজ কেমন জ্যোৎস্না!

জ্যোৎস্না তোমার ভাল লাগে?

নাঃ। আমার কিছু ভাল লাগে না। কান্না পায়।

যাও, শুয়ে পড়ো। ঘুমোও।

আজ আমি পরী হয়ে উড়ে যাব।

কোথায় যাবে?

উড়ে বেড়াব। তুমি এরোপ্লেনে চড়েছ?

না তো!

কেমন লাগে গো?

জানি না।

ভয় করে?

আমার তো খুব ভয় করবে। তুমি শুয়ে পড়ো।

এখন শোবো না। এমন জ্যোৎস্না! বলে শ্রীময়ী আবার গান গাইতে লাগল, যত পারো পয়সা বাঁচাও...

আমি চাপা স্বরে বললাম, এই শ্রীময়ী!

কী বলছ?

তুমি আর কোনও গান জানো না?

জানি।

আর কী গান জানো?

জানি। কিন্তু মনে পড়ছে না।

এটা কিন্তু বিচ্ছিরি গান। একটা ভাল গান গাও না! চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে গানটা জানো?

না তো!

আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।

আমি শিখব না।

এ গানটা আর গেও না। এটা বিচ্ছিরি গান।

আমার এটাই আসে।

ওরা বুঝি তোমাকে সব সময়ে পয়সা বাঁচাতে বলে?

পয়সা কত দামি জিনিস।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। বাথরুমে চোখে মুখে জল দিতে দিতে মনে হল, না, এ জীবনে আর বিয়ে করব না। কিছুতেই না। বিয়ের চেয়ে মরণ ভাল। মরে যদি ভূত হতে পারি তাহলে চলে যাব সেই উপত্যকায়, পাহাড়ে, জঙ্গলে, নদীর ধারে ধারে এলোচুলে খালি পায়ে গান গাইতে গাইতে…

॥ সোমলতা ॥

শুঁটকি রাঁধছিস বুঝি? বেশ চনমনে গন্ধ!

না তো! আমরা শুঁটকি খাই না।

এঃ, নবাবনন্দিনী এলেন! শুটকি খান না! কেন, খেলেই তো পারিস। বেশ লঙ্কাবাটা, পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে মাখা-মাখো ঝাল গরগরে হবে। খাস না কেন?

গন্ধ লাগে

ইঃ, গন্ধ লাগে! শুটকির গন্ধ তবে কোথা থেকে পাচ্ছি?

পাশের বাড়িতে হচ্ছে বোধহয়।

ওরা খেতে পারলে তোর খেতে দোষ কী? অত ফুটুনি কিসের?

গন্ধটা কি আপনার ভাল লাগে?

আমি বিধবা না? ভাল লাগে বলতে আছে? পাপ হয়। তুই কী রাঁধছিস?

মাছ।

কী মাছ?

ফুলকপি দিয়ে কৈ।

কী ফোড়ন দিলি?

আমরা মাছে ফোড়ন দিই না।

তুই ছাই রান্না জানিস। পাঁচ ফোড়ন দিতে হয়।

আচ্ছা।

আর কাঁচা তেল দে, একমুঠো চিনি দে, একটু সোডা ফেলে দে। দেখবি কেমন স্বাদ হয়।

আচ্ছা।

যত পারিস মাছ টাছ খেয়ে নে। আর তো দু মাস।

আমার বুক কেঁপে উঠল। রান্নাঘরে খোলা দরজার ওপাশে পিসিমা দাঁড়িয়ে। একটু অন্ধকারমতো জায়গা। শুধু থানটা দেখা যাচ্ছে। সেদিকে চেয়ে বললাম, ওকথা কেন বললেন?

তুই যে বিধবা হবি।

আমার চোখ জ্বালা করে উঠল, বুকে ঢেউ ছিল। বললাম, পিসিমা! কেন এমন হবে?

হবে না কেন? শুধু আমিই জ্বলব, তুই জ্বলবি না?

আমি কী করেছি পিসিমা? কোন পাপ?

আমিই কোন পাপ করেছিলাম? তোর কি পেটে বাচ্চা এসেছে?

জানি না তো!

এলে সেটাও মরবে। বাচ্চার দরকার নেই। স্বামীর সঙ্গে শুবি না। আলাদা থাকবি।

আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। থানকাপড়টা অদৃশ্য হয়ে গেল। এত আনমনা ছিলাম যে মাছের ঝোলটা শুকিয়ে পুড়ে ঝামা হয়ে গেল। কেউ খেতে পারল না।

রাতে আমি আমার স্বামীকে বললাম, আপনি কি ভূতে বিশ্বাস করেন?

উনি অবাক হয়ে বললেন, ক দিন আগেও একথা জিজ্ঞেস করেছ। কেন বলো তো!

বলুন না।

না ভূত টুত কিছু নেই। তোমার কি ভূতের ভয় আছে?

কী জানি। হয়তো আছে।

তুমি তো শক্ত মেয়ে, তবে এই অদ্ভুত ভয়টা কেন?

ঠিক ভয় নয়। আপনাকে বোঝাতে পারব না।

উনি আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে আলিঙ্গন করে বললেন, কোনও ভয় নেই।

সেই রাতে আমরা খুব সুন্দরভাবে মিলিত হলাম। তারপর স্বামী ঘুমোলেন। আমি দুশ্চিন্তা নিয়ে ছটফট করতে লাগলাম।

উনি কখন আসবেন তার ঠিক ছিল না। তবে রাতে রান্নার সময়েই বেশি আসতেন। ভুল পরামর্শ দিতেন। মাছে বা মাংসে চুলের দলা, ছাই বা মরা টিকটিকি পাওয়া যেত প্রায়ই। বিছানায় প্রচণ্ড লাল পিঁপড়ের উৎপাত হওয়ায় কাড়তে গিয়ে দেখি, বিছানায় চিনির দানা ছড়ানো।

একদিন বললাম, এসব কী হচ্ছে পিসিমা?

হবে না কেন রে? আমি সংসারে কোন সুখটা পেয়েছি?

শুনেছি, আপনি এ সংসারের মাথায় ছিলেন!

তোর মাথা। গয়নার বাক্সখানা ছিল বলে খাতির করত। ওই জোরেই তো বাপের বাড়িতে ঠাঁই হল। নইলে ঝ্যাঁটা মেরে তাড়াত।

তাহলে আপনি এখন কী চান পিসিমা?

এখন চাই তোর স্বামী মরুক, তোর সন্তান না হোক, তুই বিধবা হ। তারপর তুইও মর। সবাই মরুক। দুনিয়াটা ছারখার হয়ে যাক। ঘরে ঘরে আগুন লাগুক।

মা গো!

কেন, খারাপ লাগছে শুনতে? মর মাগী, খারাপ কী রে? আমার মতো হলে বুঝবি চারদিকটা শ্মশান হয়ে না গেলে সুখ নেই।

দু মাসের মাথায় আমার স্বামী মারা গেলেন না।

পিসিমা একদিন আড়াল থেকে বললেন, কেমন লাগে রে?

আমি বললাম, কী কেমন লাগে?

পিসিমা লজ্জা মেশানো গলায় বলেন, আহা, ন্যাকা কোথাকার! বোঝে না যেন! ওই যে ওসব, যখন বরের সঙ্গে ওসব হয় টয়।

ছিঃ পিসিমা।

ইস্, একেবারে লজ্জাবতী লতা! কেন জানতে চাইলে দোষ হয় বুঝি? সাতে বিয়ে, বারোতে বিধবা। আমার কি আর তখন বোঝবার বয়স ছিল? যখন শরীর ডাকাডাকি শুরু করল তখন মাথার চুল মুড়িয়ে কেটে পাথরের থালায় একবেলা বিস্বাদ আলোচালের ভাত খাই। একাদশী করি। আমার জ্বালা তুই বুঝবি না। বল না কেমন লাগে।

ভাল।

দূর মাগী। ভাল তো সবাই জানে। খুলে বল না।

আমার লজ্জা করে পিসিমা।

তাহলে মর। মর মর মর মর।.এখনই মর।

ও মা গো! ওভাবে বলতে আছে?

একশবার বলব।

আমাদের অবস্থা পড়তির দিকে। ধীরে ধীরে পয়সার টান পড়ছে। খরচ বাড়ছে। আমার স্বামী একদিন বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ। এখন বোধহয় আমাদের কিছু করা উচিত। কি করব বলো তো!

ব্যবসা করুন না।

দোকানদারিই করব?

দোষ কী? আপদ্ধর্ম হিসেবে সবই করা যায়।

টাকা কোত্থেকে আসবে?

বিয়েতে আমি অনেক গয়না পেয়েছি। আপনাদের বাড়ি থেকেই পাওয়া। পিসিমা একটা হার দিয়েছিলেন, ভরি দশেক হবে। একজোড়া বালা আছে, পাঁচ ভরির কম নয়। হীরের আংটি আছে।

বলো কী? এসব বেচব?

না আপনি বেচবেন কেন? আমি বেচব। টাকা আপনাকে দেব।

তোমার কী থাকবে?

আপনি থাকবেন।

সেইদিন সন্ধেবেলা পিসিমা হাজির হলেন।

আমার আশীর্বাদী হারছরা বেচে দিলি?

হ্যাঁ পিসিমা।

কোন সাহসে? কুড়িকুষ্ঠ হয়ে পচে গলে মরবি যে।

মরতে চাই না বলেই তো বেচেছি।

বড় বউয়ের কী দশা করেছিলাম মনে আছে?

আছে।

তোরও ব্যবস্থা করব নাকি?

না পিসিমা। ক্ষমা করুন। আমাদের উপায় নেই। থাকলে কেউ সোনা বিক্রি করে?

তুই ছোটলোক বাড়ির মেয়ে, সব পারিস। বুড়ি ছুঁয়ে আছিস বলে তেমন কিছু করছি না।

বুড়ি ছুঁয়ে আছি? বুড়ি ছোঁয়া কাকে বলে?

ওরে, আমি বালবিধবা না হলে দেখতি বরকে আমিও কত ভক্তি করতুম। কিন্তু সেই অলপ্পেয়েটা তো বিয়ের সময়েই আধবুড়ো ছিল। তার ওপর কাশের রোগ। টক করে মরেই গেল।

ওরে, আমি বালবিধবা না হলে দেখতি বরকে আমিও কত ভক্তি করতুম। কিন্তু সেই অলপ্পেয়েটা তো বিয়ের সময়েই আধবুড়ো ছিল। তার ওপর কাশের রোগ। টক করে মরেই গেল।

বেঁচে থাকলে কী করতেন?

পিসিমা লজ্জা-লজ্জা গলায় বললেন, কত কী করতাম! অনেক সোহাগ করতাম, তোর মতো। সব সময়ে চোখে চোখে রাখতাম।

আমি হাসলাম।

উনি বললেন, আমার বিয়ের সময় সোনার ভরি ছিল কুড়ি টাকার মতো। এখন কত হয়েছে রে?

হাজার টাকা।

বলিস কী? তুই তো রাক্ষুসী! অত টাকা তোর সইবে? সোনার অভিশাপ আছে, তা জানিস? ও দোকান উচ্ছন্নে যাবে। এ বাড়ির ছেলেকে ব্যবসাদার বানালি? নরকে তোকে ময়লার বালতিতে চুবিয়ে রাখবে। তোর মরা ছেলে হবে, দেখিস।

আমার বুক ভীষণ কেঁপে উঠল। মাত্র কয়েক হাজার টাকা মূলধন নিয়ে আমার স্বামী দোকান দিলেন। দোকান দিতেই কত খরচ হয়ে গেল আসবাবপত্র কেনা, সাজানো গোছানোর খরচ সামলে মাল কেনার পয়সাতেই টান পড়ে গেল। কিছু ধার-দেনা করে কোনওরকমে দোকান সাজিয়ে বসলেন তিনি। কিন্তু অভিজ্ঞতা নেই, হিসেবে ভুল করেন, বড়বাড়ির ছেলে হয়ে নানান ধরনের খদ্দেরের সঙ্গে বিনীতভাবে কথা বলতে তাঁর মর্যাদায় লাগে। তার ওপর চেনা লোক বা বন্ধুবান্ধবরা জিনিস নিয়ে দাম বাকি ফেলে রেখে যায়। একজন কর্মচারী রাখা হয়েছিল, সে এক মাস বাদে টাকা আর দশ-বারোখানা বেনারসী চরি করে পালিয়ে গেল।

উনি ভীষণ হতাশ হয়ে আমাকে বললেন, এ রকমভাবে চলবে না। পারছি। না।

আমি কিন্তু ভেঙে পড়লাম না। তেমন দুর্বিপাক হলে, মস্ত ক্ষতি হলে, পিসিমার একশ ভরির ওপর সোনার গয়না তো আমার কাছে আছে। দরকার হলে তাতে হাত দেব। তাতে বাঁচি মরি ক্ষতি নেই।

আমি বললাম, ব্যবসা মানেই ওঠা-পড়া। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি তো আপনার পিছনে আছি।

তোমার সাধের গয়নাগুলো গেল।

আপনিই আমার সবচেয়ে বড় গয়না।

আমার স্বামী গম্ভীর মানুষ। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমার এত বয়স অবধি ঠিক এভাবে আমাকে কেউ কিছু বলেনি। আমার ওপর তোমার এত ভালবাসা দেখে অবাক হই। কেন এই অপদার্থকে এত ভালবাসো বলো তো! আমার যে বড় আত্মগ্লানি হয়। আমি আজ বুঝতে পারছি, আমি কোনও কাজেরই নই, কোনও যোগ্যতাই নেই আমার।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, আপনি তবলা বাজানো তো ছেড়েই দিয়েছেন দেখছি। ওগুলোয় ধুলো পড়ছিল। আমি মুছে-টুছে রেখেছি। একটু তবলা বাজান না, মনটা ভাল হবে। আমি তানপুরা ধরছি।

এ প্রস্তাবে উনি খুব খুশি হলেন। অনেকক্ষণ তবলা বাজানোর পর ওঁর মনটা ভাল হয়ে গেল। বললেন, বেশ একটা মুষ্টিযোগ বের কঁরেছ তো!

ওঁকে ঘিরেই আমার জগৎ। আমি যে ওঁকে ভালবাসি তা ওঁর রূপের জন্যও নয়, গুণের জন্যও নয়। ভাল না বেসে থাকতে পারি না বলে বাসি। এই ভালবাসাটুকুই আমার প্রাণের পিদিমকে জ্বেলে রাখে। এসব আমি কাউকে বলতে পারব না। ওঁকেও নয়। আমার শ্বাসে-প্রশ্বাসে মিশে থাকে ওঁর চিন্তা, ওঁরই ধ্যান। আবার উনি আমার দিকে বেশি ঢলে পড়লেও আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি। উনি যদি স্ত্রৈণ হয়ে পড়েন তা হলে পুরুষের ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হবেন। স্ত্রৈণ পুরুষকে কেউ সম্মান করে না, মূল্য দেয় না, তাদের ব্যক্তিত্বও থাকে না। এক-একদিন উনি দোকানে যেতে চান না, বলেন, আজ দোকান থাক। আজ তোমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করছে। আমি অমনি উঠে পড়ে বলি, তা হলে আমাকে গিয়ে দোকানে বসতে হবে।

এইভাবে নরমে, গরমে, শাসনে, সোহাগে মানুষটাকে নিরন্তর আমি ব্যস্ত রাখি। এঁরা বংশগতভাবে অলস, আয়েসি। একটু রাশ আলগা দিলেই নেতিয়ে পড়েন।

দোকান দেওয়ার ঘটনাটা এ বাড়ির কেউ ভাল চোখে দেখেননি। বিশেষ করে দুই শ্বশুর এবং ভাসুর। ছোটখাটো অশান্তি লেগে যেত প্রায়ই। শ্বশুরমশাই আমার স্বামীকে ডেকে বললেন, দোকান করা কোনও ভদ্রলোকের কাজ? তুই তো বংশের নাম ডুবিয়ে দিলি! ছিঃ ছি, পাঁচজনকে মুখ দেখাতে পারি না।

ভাসুরও খুব বিরক্ত। খেতে বসে প্রায়ই শোনাতেন, ও রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়াই কঠিন হয়েছে। বন্ধুরা টিটকিরি দিচ্ছে।

জ্যাঠাশ্বশুর খুব সরব নন, তবে মাঝে মাঝে বলেন, এ হল বৈশ্যবৃত্তি। পাতিত্য।

দোকানের পিছনে যে আমার হাত আছে এটা তাঁরা জানতেন। একদিন শাশুড়ি, আমাকে ডেকে বললেন, এঁরা তো সব তোমার ওপর খাপ্পা। কিন্তু আমি বাপু তোমাকে একটুও দোষ দিই না। ফুচু যে নড়াচড়া করছে, শরীরের আর মনের মরচে যে ঝরছে এতেই আমি খুশি। আজ বিকেলে বোধহয় তোমার সঙ্গে তোমার শ্বশুর এ নিয়ে কথা বলবেন। ঘাবড়ে যেও না।

কিন্তু ঘাবড়ে আমি গেলাম। শ্বশুর ভাসুরের সঙ্গে খুব সামান্যই কথা হয়। আমি কি বুঝিয়ে বলতে পারব?

দুপুরবেলাটা খুব আনমনা কাটছিল। একা ঘরে হঠাৎ কার উপস্থিতি টের পেয়ে তাকিয়ে দেখি, ঘরের কোণে সেই থানকাপড়। অস্পষ্ট অবয়ব।

কী রে, এবার? মজা বুঝবি। তোর শ্বশুর রাগী লোক, আজ তোকে জুতোপেটা করবে।

আমি বললাম, করুক।

শোন, যা বলছি তা ঠিক ঠিক করলে বেঁচে যাবি।

কী করব?

তোর শ্বশুরের একটা গোপন খবর আছে। সেটা জানিস?

না তো!

ওর একটা রাখা মেয়েমানুষ আছে। তার নাম চামেলী। খালধারে থাকে। চামেলীর পিছনে অনেক খরচা করেছে। টাকাপয়সা সোনাদানা। শ্বশুর চোখ রাঙালে তুইও বলবি, চামেলীর কথা জানি। তা হলেই ঘাবড়ে যাবে।

আমি জানি এসব বনেদি পরিবারে কিছু বদ অভ্যাস থাকে। শ্বশুরের রক্ষিতা থাকলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি চুপ করে রইলাম।

পিসিমা বললেন, কথাটা মানলি না বুঝি?

আমি ওসব বলতে পারব না।

তা পারবি কেন? আরও শুনবি? তোর বরেরও আছে, তার নাম কমলা। ভাবছিস তোকে নিয়ে রসে মজে থাকে? মোটেই নয়। তোর রূপেরই বা কী ছিরি, গুণেরই বা কী। ভাবছিস মাথাটা খেয়ে বসে আছিস? কচুপোড়া। ফাঁক পেলেই কমলার কাছে যায়।

আমি শিহরিত হলাম। দু চোখ জলে ভরে উঠল।

হঠাৎ শুনি পিসিমা কাঁদছেন, এ বাড়ির পুরুষরা কি কেউ কম? সব বদমাশ, সব কটা হাড়ে হারামজাদা। ওই তোর জ্যাঠাশ্বশুর, ভাসুর কেউ কম যায়? প্রত্যেকটার একটা-দুটো করে মাগী আছে, ঘরের বউ তো ডাল-ভাত। তাতে কি ওদের হয়? নিজেরা ফুর্তি করেছে, আর আমাকে গয়নার বাক্স খেলনা দিয়ে বসিয়ে রেখেছে ঘরে। বোকা বলে ভুলেও থেকেছি। রামখেলাওন বলে একটা চাকর ছিল। তখন আমার সোমত্থ বয়স। শরীরে জোয়ার-ভাটা ডাক দিচ্ছে। রামখেলাওন ছিল সা-জোয়ান মানুষ। ধকধক করছে ডাকাতের মতো শরীর। শুনছিস?

বলবেন না পিসিমা, পায়ে পড়ি।

ইস, বড় সতী এসেছেন! কেন শুনবি না? ভাল করে শোন। শেষে সেই রামখেলাওনকে একদিন ইশারা করলাম। সে নিশুতরাতে এল। বিধবার সব ধর্ম ভাসিয়ে দিয়ে সেদিন ইচ্ছেমতো পাপ করার বাসনা ছিল। আগুন জ্বলছিল শরীরে। বাঘিনীর মতো বসে আছি খাপ পেতে। ঠিক সেইসময় বোকা লোকটা শেষ সিঁড়িতে পা হড়কে আছাড় খেল। তারপর সে কী কাণ্ড! তোর জ্যাঠাশ্বশুর আর শ্বশুর মিলে কী মার মারল লোকটাকে। মেরে তাড়িয়ে দিল। শুদ্ধাচারী বালবিধবা বোন উপোসী রয়ে গেল। আর ওরা পরদিনই কানে আতর গুঁজে গেল রাখা মেয়েমানুষের কাছে। শুনছিস?

শুনছি পিসিমা।

কাঁদছিস বুঝি? খুব কাঁদ, প্রাণভরে কাঁদ। তোর বুকে লঙ্কাবাটার জ্বলুনি হোক। যদি বাঁচতে চাস আজই শ্বশুরের মুখের ওপর বলবি, আমি চামেলীর কথা জানি। বুঝেছিস?

পারব না পিসিমা।

তা হলে মর, মর, মর, মর, এখনই মর। তোর কুড়িকুষ্ঠ হোক। তোর বাপ মা মরুক, ভাই বোন মরুক, বেটা-বেটি মরুক।

চোখের জলে আমি ভাসছিলাম। বুকে পাষাণভার।

জ্বলছিস তো! এবার ওদেরও মুখে নুড়ো জ্বেলে দে। রগড়ে দে। সংসারে আগুন লাগা। শ্বশুর, ভাসুর, বর সব কটাকে মুখে জুততা ঘষে দে। মরুক, ওলাউঠা হয়ে মরুক, গলিত কুষ্ঠ হোক। শুনছিস তো!

জবাব দিতে পারলাম না।

আমার মতো জ্বলুনি যেদিন হবে সেদিন বুঝবি।

সন্ধেবেলা নীচের বৈঠকখানায় সবাই বসলেন। শাশুড়ি এসে ডাকলেন আমাকে, এসো বউমা। ডাকছে। মাথা ঠাণ্ডা রেখো।

বুকটা বড় ভার ছিল সেদিন।

শ্বশুরমশাই গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, ছোটো বউমা, বোসো। কথা আছে। বেশ গুরুতর কথা।

আমি বসলাম না। দরজার পাশটিতে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শ্বশুরমশাই বললেন, এইসব দোকান-টোকান দিয়ে আমাদের যে বংশের বড় অপমান হয়ে যাচ্ছে। এটা তো মোটেই সম্মানজনক ব্যাপার হয়নি। আমাদের বংশের ছেলে সামান্য দোকানদার হবে এটা কেমন কথা?

আমি চুপ করে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জ্যাঠাশ্বশুর বললেন, আমরা এও শুনেছি বিয়ের সময়ে তোমাকে যে সব গয়না যৌতুক দেওয়া হয়েছিল সেগুলি বেচেই দোকান করা হয়েছে। গয়নাগুলো হল তোমার গুরুজনদের দেওয়া আশীর্বাদ। তুমি আশীর্বাদের মূল্য দাও না? গয়না বিক্রি করায় যে তাঁদের অপমান হল!

ভাসুর বললেন, দোকানই বা দিতে হবে কেন? অন্য সব ব্যবসা তো আছে। দোকানে ক'পয়সাই বা আয়? এই তো শুনলাম, এক মাসেই বহু টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে। কর্মচারী চুরি করে পালিয়েছে।

শ্বশুরমশাই বললেন, তোমার বক্তব্যও আমরা শুনতে চাই। যুগ পাল্টে গেছে। আগে বাড়ির বউ-ঝিদের মতামতকে মূল্য দেওয়া হত না। আজকাল কাদের মুখ ফুটেছে। তুমি বলো।

আমি কোনও কথাই বললাম না। ওঁরা এখন উত্তপ্ত হয়ে আছেন। আমার কানও কথাই ওঁদের গ্রহণযোগ্য মনে হবে না।

শ্বশুরমশাই বললেন, রসময়ীর (পিসিমার নাম) গয়নাগুলো চুরি যাওয়াতে আমরা একটু মুশকিলে পড়েছি ঠিকই, কিন্তু এসব কেটে যাবে।

আমি বুঝলাম না, এ পরিবারের আর্থিক সংকট কিভাবে কাটবে বলে উনি মনে করেন। খুব মৃদুস্বরে এবার আমি বললাম, গত মাসে চালের আর তেলের দাম বেড়েছে। বাজারের বরাদ্দ কমেছে। মুদির দোকানে দু মাসের ধার জমে আছে।

ওসব জানি। পাকিস্তানে আরও কিছু জমি আর একটা পুকুর শিগগিরই বিক্রি হয়ে যাবে। ও টাকা এলে আর চিন্তা নেই।

আমি ঘরে চলে এলাম। একটু বাদে আমার স্বামীও এলেন। আমাকে বললেন, ওদের মত হল দোকানটা বিক্রি করে দেওয়া।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, কাল থেকে দোকানে আপনার বসবার দরকার নেই। আমি বসব।

তুমি! বলে তিনি হাঁ করে রইলেন।

আমি ওঁর মুখের দিকে সজল চোখে চেয়ে বললাম, আপনাকে আজ আমার আর একটা কথা বলার আছে। অভয় দিলে বলব।

উনি অবাক হয়ে বলেন, বলো না।

আপনি কি অন্য কোনও মেয়েকে ভালবাসেন?

কী বলছো?

তাঁর নাম কি কমলা?

উনি যেন কুঁকড়ে গেলেন। এত অসহায় দেখাল লম্বা চওড়া সুদর্শন পুরুষটিকে! আমি বললাম, শুনুন, সংকোচ করবেন না। যদি কমলাকে আপনার প্রয়োজন হয় তা হলে আপনি ওঁকে বিয়ে করে ঘরে আনুন। আমি সতীন সহ্য করতে পারব।

উনি বিছানায় বসে দু হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন। লজ্জা!

আমি দু চোখে ধারা বিসর্জন করতে করতে বললাম, গোপনে তার কাছে যাওয়ার দরকার নেই। গোপন যেখানে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ে সেইখানেই দুর্বলতা, সেইখানেই পাপ। আপনাকে সে পাপ আমি করতে দিতে পারি না।

উনি অনেকক্ষণ মুখ ঢেকে বসে রইলেন। তারপর বিষণ্ণ, লজ্জাতুর মুখখানা তুলে বললেন, তোমাকে কমলার কথা কে বলল?

সেটা কি খুব জরুরি?

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বিয়ে করার প্রশ্ন ওঠে না। তুমি আসার পর তার কাছে আমি খুব কমই যাই।

শুনুন, অপরাধ নেবেন না। আপনি যাতে ভাল থাকেন আমি তাই চাই। সবচেয়ে বড় কথা, আপনাকে নিয়ে আমি গৌরব করতে চাই। আপনিই তো আমার অহংকার। আপনি কিছু গোপন করবেন না। এটুকু জানবেন, আপনাকে খারাপ ভাববার সাধ্যই আমার নেই।

তুমি আমাকে ঘেন্না করছ না?

একটুও না। আপনি দয়া করে আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন না। নত হবেন না।

উনি বিস্ময়ভরে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, আমার বিশ্বাস হয় না।

কী বিশ্বাস হয় না?

তোমাকে রক্তমাংসের মানুষ বলে।

ওকথা বললে আমার পাপ হয়। তার চেয়েও বড় কথা আপনি নিজেকে সবসময়ে অপরাধী ভাবতে ভাবতে ছোট হয়ে পড়বেন।

উনি আর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তা হলে তোমাকে বলি, আমাদের দোকানের কর্মচারী ধীরেন টাকাপয়সা চুরি করে পালিয়েছে বটে, কিন্তু বেনারসীগুলো সে নেয়নি।

কে নিয়েছে? কমলা?

হ্যাঁ, একদিন দোকানে এসে নিয়ে গেল। এখন আর উদ্ধার করা যাবে কি?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না। কুড়িটা বেনারসীর এমন কিছু দাম নয়। কমলা এটুকু পেতেই পারে। যদি তাকে বিয়ে করেন তা হলে সে তো আরও অনেক পাবে।

উনি জিব কাটলেন, বিয়ের কথা তুলছ কেন?

তা হলে কী ধরে নেব?

যা হয়েছে তা আর হবে না।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, পুরুষেরা চঞ্চলমতি, বহুগামী হয়। আপনি যদি আবার ও কাজ করেন তা হলেও কিছু মনে করব না। শুধু কথা দিন, আমার কাছে গোপন না থাকে।

উনি মূক বিস্ময়ে শুধু মাথা নাড়লেন। ওঁর চোখে একটা ভয় বা আতঙ্ক দেখা দিল। উনি আমাকে স্বাভাবিক স্ত্রীলোক বলে ভাবতে পারছেন না আর।

কিন্তু আমি জানি আমি খুব সাধারণ স্ত্রীলোক। আমি শুধু এই সংসার থেকে আমার পাওনাটুকুই কুড়িয়ে নিতে চাই আমার আঁচলে। বিরুদ্ধতা থাকবে, অদৃশ্য শত্রু থাকবে, দুর্বিপাক থাকবে, দৈব থাকবে, তার ভিতর দিয়েই তো যেতে হবে। বুদ্ধিভ্রংশ হলে তো চলবে না। আমি যদি কমলাকে নিয়ে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া অশান্তি করতাম তা হলে ওঁকে পেতাম কী করে? বরং আহত পৌরুষ, অপমানিত অহং আরও শক্ত হত। উনি জেদ করে কমলার কাছে আরও যেতেন। জ্বলেপুড়ে আমি খাক হতাম। তার চেয়ে আমি ওঁর দরজা খোলা রাখলাম। উনি ইচ্ছে করলেই অন্য মেয়েমানুষের কাছে যেতে পারবেন। কিন্তু ওঁর আর যাওয়ার ইচ্ছে হবে না।

সেদিন সারারাত বারবার আমার ঘুম ভাঙল, আর আমি শুনতে পেলাম, পিসিমা আমার ঘরের চারদিকে ঘুরে ঘুরে কেবল বলছেন, মর, মর, মর, মর, মর, মর···বিধবা হ···বিধবা হ···কুড়িকুষ্ঠ হোক···

আমি শ্বশুর ভাসুরদের কথার প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু আমি আমা স্বামীকে প্ররোচিত করতে পারলাম। বললাম, শুনুন, দোকানে আপনি না গেলে আমি যাব। সম্মান রাখতে গেলে আগে বাঁচতে হবে।

উনি বললেন, ঠিক আছে। আমিই যাচ্ছি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আপনাকে একা দোকানের ভার দিলে আপনি হয়তো অস্বস্তিতে পড়বেন। আমিও থাকব আপনার সঙ্গে।

বাড়ির লোক কী বলবে?

ওঁরা কয়েকদিন বলবেন। তারপর আর বলবেন না। সয়ে নেবেন। দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে ওঁরাও তো দেখছেন। মুখে প্রতিবাদ করলেও দোকান থেকে যদি আমরা লাভ করতে থাকি তা হলে ওঁরা একদিন সমর্থনও করবেন।

তুমি বলছ! তুমি কখনও বোধহয় ভুল বলল না। ঠিক আছে, তাই হবে।

ভাবালুতা আমার নেই। আমার আছে ভয়, আছে উদ্বেগ, আছে বাস্তব জগৎ থেকে যতখানি পারা যায় বেঁচে থাকার খুঁটিগুলি খুঁটে তুলে নেওয়ার চেষ্টা। আমরা দুজনে যখন দোকান আগলে বসতে লাগলাম তখন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে, ওঠা-পড়ায়, লাভ-লোকসানে আমাদের মধ্যে সত্যিকারের ভালবাসা হল। এল বিশ্বাস, নির্ভরতা, পরস্পরকে আরও শ্রদ্ধা করা।

উনি হিসেব রাখতে হিমসিম খান, স্টকের খোঁজ রাখেন না, ধারে মাল দিয়ে দেন। যতদিন কর্মচারী ছিল ততদিন তার ওপরেই নির্ভর করতেন। তাই মাত্র ক'দিনেই দোকানটার বড় দুর্দশা হয়েছে। হিসেব আমিও রাখতে জানি না, স্টক মেলানো কাকে বলে তাও কি জানতাম? কিন্তু সন্তান-লালনের কিছু না জেনেও একজন মেয়ে যখন প্রথম মা হয় তার কি আটকায়? দোকান ছিল আমার সন্তানের মতো। ওঁকে সেটা বোঝাতে আমার একটু সময় লেগেছিল। আরও একটু সময় লেগেছিল গা থেকে জমিদারির ধুলো ঝেড়ে ফেলে শ্রমিকের মতো পরিশ্রমী করে তুলতে। দোকান লাভ দিতে শুরু করল।

এ শহরের পাইকারদের কাছ থেকে মাল কিনলে লাভ বেশি হয় না। কিন্তু কলকাতার বড়বাজার বা মংলাহাট থেকে কিনলে অনেক বেশি লাভ হয়। আমার স্বামীকে সেটা বুঝিয়ে বলে রাজি করালাম। অলস এবং ঘরকুননা লোকটি রাজি হচ্ছিলেন না। প্রথম দুবার আমি সঙ্গে যাই। এরপর উনি একা যেতে লাগলেন।

প্রতিদিন মানুষের রুচি পাল্টায়, এক-এক বছর এক-এক রং বা ডিজাইনের ভীষণ চাহিদা হয়, বুদ্ধি করে ফাটকা খেলতে হয়। আমরা সেসব মাথায় রেখে মাল কিনতাম। লাভ বাড়তে লাগল।

একদিন শ্বশুরমশাই সন্ধের পর অপ্রত্যাশিত দোকানে হানা দিলেন। কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, গলায় চাদর, হাতে ছড়ি, পায়ে নিউ কাট। চারদিকে তাচ্ছিল্যের চোখে একটু তাকিয়ে দেখলেন। দোকানে তখন খদ্দেরের বেশ ভিড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিক্রিবাটা দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর চলে গেলেন।

এলেন আবার কয়েকদিন বাদে। আমি বসতে চেয়ার এগিয়ে দিলাম। বসলেনও।

বেশ বিক্রি দেখছি।

আপনাদের আশীর্বাদে হয়।

আমি আশীর্বাদ করিনি তো বউমা। আমি তো অভিশাপই দিই। আমার কোনওটাই ফলে না। পাপী লোক তো।

চুপ করে রইলাম।

উনি বললেন, আমাদের কথা অমান্য করেছ, সেটা ভাল করোনি। কিন্তু তুমি যা করো তা শেষ অবধি ভালই হচ্ছে দেখছি। মাসে কত আয় হচ্ছে?

দু-চার হাজার হবে।

সে তো অনেক টাকা!

ওঁর পৌরুষে এবং আত্মসম্মানে লাগবে বলেই আমি বললাম না যে, পাকিস্তান থেকে ওঁদের জমি আর পুকুর বিক্রির টাকা আজও আসেনি, বিক্রি করার মতো সোনাও আর নেই, তবু সংসার যে চলে যাচ্ছে তা তো ম্যাজিকে নয়। বলার দরকারও ছিল না। উনি সেটা জানেন। জানেন বলেই দোকানটা দেখতে আসেন আজকাল।

ওঁর মুখে তাচ্ছিল্যের হাসিটা ছিল না। ওঁর চোখের সামনেই দু হাজার টাকায় দুটো বিয়ের বেনারসী বিক্রি হয়ে গেল।

উনি নড়েচড়ে বসে বললেন, আচ্ছা বউমা, ও দুটো বেনারসী থেকে তোমাদের কত থাকল?

আমি লাজুক হাসি হেসে বললাম, বেনারসীর দাম, তার সঙ্গে গাড়িভাড়ার একটা ভগ্নাংশ, দোকানের ভাড়া, বিজলির খরচ, কর্মচারীর মাইনে এসবে এক একটা গড় করে যোগ দিয়ে তবে দাম ফেলতে হয়।

উঃ, সে তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! এত হিসেব করো কী করে? আমরা বরাবর মুঠো মুঠো টাকা উড়িয়ে দিয়েছি, গুনেও দেখিনি। এটা তো দেখছি ছোটলোকের কাজ!

আমি মৃদুস্বরে বললাম, ও দুটো শাড়ি থেকে আমাদের ছশো ত্রিশ টাকা লাভ হয়েছে।

উনি যেন একটু চমকে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, ছশো ত্রিশ! মাত্র দুটো বেনারসীতে!

বিস্ময়টা নিয়ে উনি বেশ চিন্তিত মুখে ফিরে গেলেন।

আরও কয়েকদিন পর উনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন, সকালে তোমাকে খুব তাড়াহুড়ো করে দোকানে যেতে হয় দেখেছি। শোনো, সকালে তো আমি ফ্রি থাকি। আমিই গিয়ে ফুচুর সঙ্গে বসবখন।

শুনে আমি ভয় পেলাম। ওঁর জমিদারি মেজাজ। হয়তো খদ্দেরদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন না। বললাম, আপনি কেন কষ্ট করবেন? ওখানে আপনাকে মানায় না।

উনি একটু হাসলেন, ভয় পেও না। ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝতে দাও। ভেবে দেখেছি, ভগবান মগজ বলে যে জিনিসটা দিয়েছিলেন সেটা কোনও কাজেই তো লাগালাম না। বুড়ো বয়সে একটু মগজের জড়ত্ব ছাড়ানোর চেষ্টা করে দেখিই না।

আমি আর বাধা দিলাম না। উনি গেলেন। আমার স্বামী ফিরে এসে দুপুরে আমাকে বললেন, কী কাণ্ড! বাবা সব শাড়ির দাম বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছিল। দুজন খদ্দের ভেগে গেছে। বাবাকে পাঠালে কেন? উনি তো খেতে পর্যন্ত এলেন না। বললেন, তুই খেয়ে আয়, তারপর আমি যাব।

উনি জোর করে গেলেন। থাক, বাবাকে আপনি এ নিয়ে কিছু বলবেন না। উনি লাভ বাড়াতে চাইছেন। প্রথম প্রথম ওরকম হয়।

আমি আর আমার স্বামী এ নিয়ে একটু হাসাহাসি করলাম।

আমার স্বামী দোকানে ফিরে যাওয়ার পর শ্বশুর এলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত, মুখ চোখ ঝলমল করছে। এসেই বললেন, বউমা, এসব তোমার কর্ম নয়। আমি আজ সাতটা শাড়ি বিক্রি করে এলাম। সব কটা চড়া দামে। একটা শাড়ির কোণে পেনসিলে লেখা ছিল পঞ্চাশ টাকা। কী করলাম জানো? পঞ্চাশের আগে একটা এক বসিয়ে দিলাম। সেই শাড়ি দেড়শ টাকাতেই বিক্রি হয়ে গেল। বুঝলে? বাড়তি একশ টাকা লাভ।

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। দোকানের সুনাম সবে হচ্ছে। খদ্দের যদি শাড়িটা যাচাই করে তা হলে ফিরে এসে হয় ঝগড়া করবে, নয়তো ফেরত দিতে চাইবে। ভবিষ্যতে দোকানের ছায়াও মাড়াবে না। কিন্তু শ্বশুরকে সেটা বোঝানোর সাধ্য কী? উনি নতুন খেলনা পেয়ে শিশুর মতো উৎফুল্ল উত্তেজিত। শাশুড়ির কাছে ফলাও করে দোকানদারির গল্প করতে লাগলেন। নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠল।

শাশুড়ি আড়ালে ডেকে বললেন, তোমার দোকান এবার লাটে উঠবে।

আমি হাসলাম।

উনি বললেন, ভাল চাও তো শ্বশুরের দোকানের নেশা ছোটাও।

আমি বললাম, থাক। সামলে নেব।

পরদিন দুজন খদ্দেরের সঙ্গে শ্বশুরের তুমুল বচসা হয়ে গেল দাম নিয়ে। তারা দুঁদে খদ্দের। বলেছিল, কয়েকদিন আগেই তারা যে শাড়ি সত্তর টাকায় এ দোকান থেকে কিনেছে তা তিন দিনের তফাতে একশ সত্তর হয় কী করে? এ তো চোরের দোকান। শুনে শ্বশুর আস্তিন গুটিয়ে তাদের মারতে উঠলেন। আমার স্বামী মাঝখানে পড়ে ঠেকালেন।

দুপুরে শ্বশুর বাড়িতে এসে তুমুল আস্ফালন করে বললেন, এইজন্যই তো বলি দোকানদারি হল ঘোটলোকেরই কাজ। যেসব লোক আমাদের জুতো বইবার যোগ্যতা রাখে না তারাও এসে চোখ রাঙায়?

শাশুড়ি বললেন, তা হলে তোমার দোকানে যাওয়ার দরকারটা কী? চিরকাল শালগ্রাম শিলা হয়ে থেকেছ, এখনও তাই থাকে না। সংসার তো চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

উনি রেগে উঠে বললেন, কেন, আমি কি পারি না?

কোনও দোকানদার যদি তোমাকে অপমান করে তা হলে তুমি কি আর তার দোকানে যাও?

দোকানদার অপমান করবে? আমাকে? কার ঘাড়ে কটা মাথা?

তা হলেই বোঝো, দোকানদারের অপমান খদ্দের হজম করে না। তার আরও দশটা দোকান আছে।

আমারও আরও দশটা খদ্দের আছে।

না, তা নেই। একজন খদ্দের অপমান হয়ে গেলে ঠকে গেলে, আরও দশটা খদ্দেরও কেটে পড়ে। তুমি কি ভাবে দোকানদারি মানেই হল কম দামে কিনে বেশি দামে বেচা? তা হলে তো ভালই ছিল।

শ্বশুর গুম হয়ে রইলেন। কিন্তু পরদিন থেকে তিনি দোকানে যেতেন বটে, কিন্তু আর কোনও ঝামেলা করতেন না। বরং বুড়ো বয়সে তিনি নতুন করে জিনিসের দাম ফেলার হিসেব শিখতে লাগলেন মন দিয়ে।

একদিন বললেন, দেখো বউমা, লোকে দরাদরি করতে ভালবাসে। দু টাকা দাম কমাতে পারলে মনে করে মস্ত জিত হল। তোমার ফিক্সড প্রাইসের দোকানে সেই সুখ নেই। আমি বলি কী, তুমি বাঁধা দরের সিস্টেমটা তুলে দাও। দাম একটু বাড়িয়ে রাখো, দরাদরি করে খদ্দের ওটুকু কমিয়ে নেবে আর খোশমেজাজে জিনিস নিয়ে যাবে।

আমি মৃদুস্বরে বললাম, সেটা তো ঠিক কথা।

উনি খুশি হয়ে বললেন, তা হলে কাল থেকে তাই করব তো?

করুন না। তবে মুশকিল হল, অনেকেই জেনে গেছে এ দোকানে বাঁধা দরে জিনিস বিক্রি হয়। কাজেই কেউ দর করবে না, দু-একজন নতুন খদ্দের ছাড়া।

উনি ভাবিত হয়ে বললেন, তাই তো! তা হলে তো সমস্যা দেখা দেবে।

উনি নিজে থেকেই পরিকল্পনাটা ত্যাগ করলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এরপর থেকে শ্বশুর সকাল বিকেল দু বেলাই দোকানে যেতে লাগলেন। বলতে নেই, উনি চমৎকার চালাতে লাগলেন ব্যবসা। আমাকে মাঝে মাঝেই বলতে লাগলেন, না, এ কাজে বেশ থ্রিল আছে। সারাটা দিন বেশ কেটে যায়, পাঁচটা লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়, নিত্যনতুন মানুষ দেখি। নাঃ, সত্যিই একটা নতুন অভিজ্ঞতা।

আমার জা ওপর থেকে নামেন না। বাতের ব্যথা, ব্লাডপ্রেশারে শয্যাশায়ী। সম্ভবত ঘটনার বছরখানেক পরেও উনি আমার সম্পর্কে ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আমি তাই ওপরে যেতাম না। ভাসুর আমার জায়ের খাবার বয়ে নিয়ে দিয়ে আসতেন। আমার সঙ্গে ওঁর দেখাই হয় না।

একদিন সন্ধেবেলায় উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন।

গেলাম। উনি আমার দিকে না-তাকিয়ে দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে রাখলেন। বললেন, অপরাধ নিও না। একটা কথা বলতে চাই। না বলে উপায় নেই।

আমি ঘরে ঢুকিনি। দরজার চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, পাছে উনি ভয় খান। বললাম, বলুন।

আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। আমার স্বামীর হাতে পয়সা নেই। ঘরে সোনাদানাও নেই যে বেচব। আমাদের আর চলছে না।

আমাকে কী করতে বলেন?

তোমাকে কী আর বলব? আমাকে বাণ মেরে অকেজো করে রেখেছ। মারোনি, সে তোমার দয়া। কিন্তু এখন আর মরতে আমার ভয় নেই। বিছানায় শুয়ে বেঁচে থাকাও যা, মরাও তাই।

আমি বাণ মারতে জানি না।

উনি আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, ভাতে মারোনি, সেও তোমার দয়া। তন্ত্রমন্ত্র জানো, মারণ উচাটন বশীকরণ জানো, তোমার অসাধ্য কিছু নেই। শুনেছি, নিজের শ্বশুরকে দোকানের কর্মচারী বানিয়ে রেখেছ।

ভুল শুনেছেন।

আমি তর্ক করতে চাই না। তুমি ইচ্ছে করলে আরও অনেক কিছু করতে পারো। সংসার ছারখার করতে পারো। সবই মানছি। কিন্তু ভয় পেলে আমার চলবে না। তাই বলছি।

একটু খুলে বলুন দিদি।

বলতে ভয়ও করছে। তবু জানতে চাইছি, সেই গয়নার কি সবটাই বেচে দিয়েছ?

একথা কেন?

মস্ত দোকান করেছ শুনলাম। অনেক টাকার ব্যাপার।

দোকান আমার গয়না বেচে করেছি। আমি আর কারও গয়নার কথা জানি না।

আমি তো ভাগ চাই না। রাগ করছ কেন? আমি ভিক্ষে চাইছি। যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তা হলে দয়া করে আমাকে কিছু দাও।

আমি জানি ভয়ের চেয়েও লোভের জোর বেশি। লোভ মানুষকে ভয় টপকাতে শেখায়, জয় করতে শেখায় না। আমার জা আমাকে যমের মতো ভয় পান, কিন্তু লোভ সামলাতে পারছেন না।

উনি চোখের জল মুছছেন বারবার। বললেন, যা করলে তার বিচার ভগবান করবেন। কিন্তু আমাদেরও কিছু পাওনা ছিল, এটা ভুলে যেও না। আমার স্বামী খুব লজ্জার মধ্যে আছেন। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না তোমাকে। ওঁর বড় অভাব। আমার চিকিৎসা অবধি বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

ওঁর বয়স তত বেশি নয়। উনি ইচ্ছে করলেই তো রোজগার করতে পারেন।

রোজগার করবে? কিভাবে করবে?

আগে ইচ্ছেটা তো হোক।

উনি হঠাৎ আমার দিকে এক পলক তাকালেন। মরিয়া হয়েই বোধহয়। সেই চোখে আমি এক পলকে গভীর ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর ভয় এক সঙ্গে দেখতে পেলাম।

উনি মুখটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, উনি লেখাপড়া বিশেষ শেখেননি। ম্যাট্রিক পাশকে কে চাকরি দেবে? আমাদের গয়নার বাক্সও নেই যে দোকান দিয়ে বসব। ইচ্ছের কথা বলছ? ওঁর ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। মনমরা হয়ে থাকেন সবসময়ে। কেবল বলেন, ফুচু কেমন দাঁড়িয়ে গেল, কত পয়সা হচ্ছে ওদের, আর আমাদের শুধু কোঁচার পত্তন। তাই বলছি, আজ আমাদের কিছু ভিক্ষে দাও।

উনি কী করতে চান?

কিছু একটা করবেন। কী করবেন তা জানি না। বলে একটু চুপ করে থেকে গলাটা এক পর্দা নামিয়ে বললেন, ধুতরো বাটা খাইয়ে পিসিমাকে মেরেছ, গয়নার বাক্স নিয়েছ, তবু আমি সে কথা কাউকে বলিনি।

বিষবিছের মতো চেপে রেখেছি নিজের বুকে। আমার প্রতি তোমার একটু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত।

ধুতরো বাটা খাইয়েছি একথা কে আপনাকে বলল?

উনি যেন এ প্রশ্নে একটু ভয় খেয়ে বললেন, রাগ কোরো না। আমি তো আর থানা-পুলিশ করতে যাচ্ছি না। এমনকি তোমার ভাসুরকেও কখনও বলিনি। এই যে মুখ বন্ধ করে আছি এর কি কোনও দাম নেই? বলো!

কী বলব তা ভেবে পেলাম না। বেশির ভাগ মানুষেরই অভ্যাস হল, যেখানে বলার কথা কিছু নেই সেখানেও অকারণে কথা বলে যায়, প্রয়োজন থাক বা না থাক। ওই অভ্যাসটা আমার নেই। আমি অকারণে অযথা কথা বলি না। প্রয়োজন না থাকলে একদমই নয়। তাই এখনও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বা ওঁর সন্দেহ নিরসনের জন্য আমি বৃথা চেষ্টা করলাম না। আমি জানি, যাই বলি না কেন উনি বিশ্বাস করবেন না।

উনি আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, চলে গেছ নাকি?

না আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?

তুমি কিছুই তো বললে না! কী ধরে নেব?

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

উনি আর একবার আমার দিকে চাইলেন। চোখ জ্বলছে। বললেন, তার মানে তুমি কিছুই দেবে না আমাদের? কিছুই না?

আমি নীরবে চেয়ে রইলাম। দেখলাম, ওঁর চোখে রাগের আগুনটা দপ করে জ্বলে উঠল। উনি এমনিতেই দজ্জাল ছিলেন। অনেকদিন ধরে নিজের উগ্রতাকে ছিপি বন্ধ করে রেখেছেন। এখন কাসুন্দির বোতলের ছিপি যেমন উগ্র ঝাঁঝে ছিটকে যায় তেমনি ওঁর ছিপিটাও উড়ে গেছে।

উনি দাঁত কড়মড় করে বললেন, রাক্ষুসী! সব খাবি? সব নিজে ভোগ করবি? অনেক ভয় পেয়ে থেকেছি, অনেক আসকারা দিয়েছি! আর নয়...

বলতে বলতে নিজের অচল ব্যাধিগ্রস্ত শরীরটাকে কেবলমাত্র রাগের ইন্ধনে উনি বিছানা থেকে ছিটকে তুলে দিলেন। তারপর এলো চুল উড়িয়ে, আঁচল খসিয়ে প্রেতিনীর মতো ধেয়ে এলেন আমার দিকে। দু'হাতের আঙুল গলা টিপে ধরার জন্য উদ্যত।

আমি অবাক হয়ে লোভ, লালসা, হিংসে, বিদ্বেষ সব কিছুর একটা মানুষী রূপ চেয়ে দেখছিলাম। সরতেও পারিনি। উনি প্রায় বাঘিনীর মতো এসে পড়লেন আমার ওপর, আজ তোকে শেষ করব... শেষ করব... তারপর মরি তো মরব... আগে তোকে শেষ করব...

কে যেন আমার কানে কানে বলল, তুইও ধর না গলাটা চেপে।

আমার জায়ের গায়ে যেন এক অসুরের শক্তি ভর করেছিল। উনি আমার গলা সাঁড়াশির মতো চেপে ধরলেন।

পিসিমা আমার কানের কাছে বলতে লাগলেন, ওরে মরবি নাকি? তা মর। দুজনেই মর। ওর গলাটাও চেপে ধর না কেন। হাত দুটো তোল না মাগী। এঃ, নুলোর মতো দাঁড়িয়ে আছে দেখ!

আমি শ্বাস নেওয়ার প্রাণপণ আর জায়ের হাত ছাড়ানোর জন্য টানা হ্যাঁচড়া করতে করতেও বললাম, না পিসিমা।

এই ‘না পিসিমা’ কথাটা আমার জা শুনতে পেলেন। তাঁর হাত শ্লথ হয়ে গেল। বড় বড় অস্বাভাবিক চোখে আমার দিকে চেয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ডাইনী! তুই ভূতপ্রেত ডাকছিস! ভূতপ্রেত ডাকছিস! তুই সব পারিস। সব পারিস! তোকে মেরে তবে মরব আমি, তোকে মেরে...

কানে কানে পিসিমা বললেন, দাঁড়িয়ে আছিস যে বড়! ও যে সর্বনাশ করবে তোর। গলাটা টিপে ধর! ধর বলছি!

আমার দুচোখ দিয়ে ধারা বইছে। আমি নিশ্চেষ্ট দাঁড়িয়ে থাকি।

পিসিমা বলতে লাগলেন, এই সুযোগ আর পাবি না। কেউ কোথাও নেই। গলা টিপে মাগীকে শেষ করে দে। কেউ টের পাবে না। কাকপক্ষীও জানতে পারবে না।

জা তড়পালেন বটে কিন্তু আর পারলেন না। আমার গলা টিপে ধরার জন্য হাত তুলে এগিয়ে আসছেন, হাতদুটো থরথর করে কাঁপছে।

পিসিমা বললেন, তুই বুঝতে পারছিস না, ও বেঁচে থাকলে তোর বড় বিপদ। একদিন তোকে ঘুমের মধ্যে গিয়ে মেরে আসবে। এইবেলা শত্রু নিকেশ কর।

আমার জা আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না। তার আগেই অচল শরীরের সব শক্তি নিঃশেষিত হয়ে পড়ে গেলেন উপুড় হয়ে। পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

আমি ধীর পায়ে নীচে নেমে এলাম।

রাত্রে আমি আমার স্বামীকে বললাম, আমার আর একটা দোকান করার ইচ্ছে।

স্বামী অবাক হয়ে বলেন, আবার দোকান! একটা নিয়ে বেসামাল হয়ে আছি। এক এক দিন এখন দশ পনেরো হাজার টাকার বিক্রি, চোখের পাতা ফেলার সময় পাই না। আবার দোকান করলে দেখবে কে?

আমি আবদারের গলায় বললাম, এখানে রেডিও টেপরেকর্ডার এসব জিনিসের ভাল দোকান নেই। খবর পেয়েছি জগু সাহার দোকানটা বিক্রি হবে। একটু দেখুন না খোঁজ নিয়ে।

স্বামী আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, তোমার গলায় ও কিসের দাগ? ইস, এ যে দাগড়া দাগড়া লাল হয়ে আছে! ছড়েও গেছে খানিকটা!

আমি মাথা নত করে বললাম, আমাকে যদি বিন্দুমাত্র স্নেহ করেন তাহলে আর জানতে চাইবেন না। পুরুষমানুষের সবকিছু জানতে নেই।

উনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, কিছু গোপন করতে চাও? বেশ।

চোখের জল সামাল দিতে আমার কিছু সময় লাগল। তারপর বললাম, একটা কথা বলতে চাই।

কী কথা?

মানুষ তখনই পুরোপুরি সুখী হতে পারে যখন তার কানে অন্য মানুষের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আসে না।

স্বামী অবাক হয়ে বললেন, এ তো নীতিবাক্যের মতো শোনাচ্ছে।

তবু বড় সত্যি। তাই না, বলুন!

কী বলতে চাও বলো না! আমি তো তোমার কথা কখনও ফেলি না।

আপনি আমার কাছে পুরুষশ্রেষ্ঠ।

উনি মৃদু হেসে বললেন, ওইসব বলে বলে তুমি আমার মাথাটা একদিন খাবে। শেষমেশ আমি নিজেই হয়তো নিজের সম্পর্কে ভাবতে শুরু করব।

আপনি বুঝবেন না, আমি কোথা থেকে শক্তি পাই, কেন অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল আমার হাত ধরে থাকে।

তোমার গলার দাগ সেরকমই একটা ঘটনার কথা বলছে কি? অমঙ্গলে মঙ্গল?

আমি আর একটু কাঁদলাম। তারপর বললাম, আমি অন্যের দীর্ঘশ্বাস শুনে সুখী হতে পারব না। আপনি ভাসুরঠাকুরের কথা কেন ভাবেন না? উনি যে দুরবস্থায় পড়েছেন।

দাদা! দাদা কেন দুরবস্থায় পড়বে! সংসার তো দিব্যি চলছে।

ওটা কী কথা হল! পুরুষমানুষের অহংকার নেই বুঝি? উনি কেন আপনার অন্নদাস হয়ে থাকবেন? ওঁকে কিছু করতে দিন।

ওঃ, দাদার জন্যই নতুন দোকান? কিন্তু ও কি পারবে?

আপনি বুঝি পারেননি?

উনি এবার আমাকে ভীষণ লজ্জায় ফেলে দিয়ে বললেন, আমি পেরেছি তোমার জোরে। আমার তো তুমি আছো, দাদার তো তা নেই।

দাদার আপনি আছেন। এ বাড়িতে দীর্ঘশ্বাস আর জমতে দেবেন না।

উনি আমার গলাটা ভাল করে দেখলেন। তারপর বললেন, আজকাল আমার কাছে কথা লুকোতে শিখছ।

আমি সাশ্রু নয়নে বললাম, না। লুকোবো না। কিন্তু সব কথারই উপযুক্ত সময় আছে। নইলে হিত কথাও বিপরীত হয়। কথারও লগ্ন আছে, দিনক্ষণ আছে। আজ নয়, সময় হলে বলব।

উনি একটা শ্বাস ফেলে বললেন, বেশ। আমি অপেক্ষা করব।

দোকান কেনার তোড়জোড় শুরু হওয়ার পর আমার শাশুড়ি আমাকে ডেকে একদিন বললেন, শুনছি তুমি তোমার ভাসুরের জন্য দোকান করে দিচ্ছ!

আমি মৃদু হেসে চুপ করে রইলাম।

উনি আমার মাথায় একটু হাত রেখে বললেন, তোমার মনটা বড় ভাল। কিন্তু একটা কথা আছে।

কী কথা?

তোমার ভাসুর এ বাড়ির আর পাঁচজন পুরুষমানুষের মতোই অহংকারী মানুষ। সে হয়তো আজ বিপাকে পড়ে তোমার দান নেবে। কিন্তু চিরকাল মনে একটা চিমটি থেকে যাবে। তাছাড়া তোমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা, ও যদি ব্যবসায় মার খায়, তাহলে জলে যাবে।

সব ঠিক হয়ে যাবে মা।

তোমার কেবল ওই কথা। শোনো, এ বাড়ির ধাঁচ আমি ভালই জানি। আমার লুকোনো কিছু গয়না আর মোহর এখনও আছে। শেষ সম্বল। তবে ও দিয়ে আর আমার কোনও কাজ নেই। এ বাড়ির উড়নচণ্ডীদের হাত থেকে এতকাল রক্ষে করে এসেছি। তুমি এগুলো বেচে দোকানটা কেনো। তাতে তোমার ভাসুরের মনে আর কোনও কাঁটা থাকবে না।

কেন মা, শেষ সম্বল যখন, ওটা থাক না।

জমিয়ে রাখারও তো কোনও মানে নেই। বরং কাজে লাগুক, ফলন্ত হোক। অপব্যয় না হলেই হল। দোকানটা তোমার ভাসুরকে দেবে বটে, কিন্তু নিজে নজর রেখো। তোমার ভরসাতেই দিচ্ছি।

আমি আর আপত্তি করলাম না।

কথাটা জানতে পারার পর আমার ভাসুরও যেন স্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর মুখে অনাবিল হাসি দেখলাম।

দোকান খুলে ভাসুর বসলেন। আমি দুবেলা গিয়ে খুব বিনীতভাবে, খুব সন্তর্পণে তাঁকে কিছু কিছু পরামর্শ দিতে লাগলাম। উনি বিনা আপত্তিতে আমার কথামত চলতে লাগলেন। দোকানে বসে তিনি আনন্দও পাচ্ছিলেন। কেননা সারাক্ষণ দোকানে গ্রামোফোন আর টেপ রেকর্ডারে গান হয়, রেডিও চলে, একঘেয়েমি নেই।

দোকান ধীরে ধীরে চলা শুরু করল।

একদিন গভীর রাতে ঘুম থেকে কে ডেকে তুলল আমায়, চোর! চোর! চোর ঢুকছে ঘরে! ওঠ, ওঠ, ওঠ শিগগির। আমার সর্বস্ব নিয়ে যাবে যে রে হতভাগী। তোর যায় যাক, আমার গয়না গেলে তোকে জ্যান্ত ফেলে দেব মজা কুয়োয়...

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সত্যিই আমাদের শিয়রের জানালায় দুটি ছায়ামূর্তি দেখা গেল। তারা গরাদ কাটছিল। আমি টর্চ জ্বালাতেই লুকিয়ে পড়ল তারা। আমি স্বামীকে ডেকে তুললাম। কিছু চেঁচামেচি হৈ-চৈ হল। চোর অবশ্য ধরা পড়ল না।

স্বামী ফের ঘুমোলেন। আমার ঘুম এল না। অন্ধকারে পিসিমার থানের আভাস দেখতে পাচ্ছিলাম।

তোর এত মোষের মতো ঘুম কেন রে মাগী? গয়নাগুলো পাহারা দিতে পারিস না? খুব স্বামীর সঙ্গে জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকা! মর, মর, মর... তোদের লাজলজ্জা নেই? অত দেয়ালা কিসের রে? বেশ্যার মতো সেজেগুজে থাকিস সন্ধেবেলা, বরকে ভোলাতে, তোর কেন শোথ হয় না? বাত হয় না? ক্ষয়কাশ হয় না? এ বাড়ির ছেলেকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিস! থুঃ... থু... থুঃ... অমন ভালবাসার মুখে থুঃ .. থু... থুঃ ..

সারা রাত পিসিমা ঘরের চারদিকে ঘুরলেন আর অবিরল থুঃ... থুঃ... থুঃ... থুঃ... থুঃ... করে যেতে লাগলেন। আজ উনি উত্তেজিত। আজ ওঁর বড় রাগ। আর একটু হলেই ওঁর অত সাধের গয়না চোরে নিয়ে যেত।

নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল খুব। পুরোনো বাড়ি, নীচের তলায় থাকি, ঘরে একশ ভরির ওপর নিরেট সোনাদানা। বাড়িতে নতুন ঠাকুর চাকর বহাল হয়েছে। আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

পরদিনই আমি সিন্দুক আনালাম। পিসিমার গয়না রইল তার মধ্যে। চাবি রইল আমার শক্ত হেফাজতে। আমাদের টাকা হচ্ছে। এক একদিন দোকানে বিক্রির পরিমাণ বিশ হাজারও ছাড়িয়ে যায়। সিন্দুক সেদিক দিয়েও আমাদের নিশ্চিন্ত করল।

বিয়ের চার বছর পর একটু পাপ ছুঁয়ে গেল কি আমাকে। একটু কাঁপিয়ে দিয়ে গেল কি আমার ভিত ভূমিকম্পে? ঝড় এসে এলোমেলো করে দিচ্ছিল কি আমার খোলা জানালা দরজার ঘর?

এবার সেই কথা বলি। আমার স্বামীকে প্রায়ই কলকাতা যেতে হয়, দিল্লি বা বোম্বাইও যেতে হয়, যেতে হয় বেনারস, কাঞ্চিপুরম। আমাদের দোকান আরও বড় হয়েছে। পাঁচজন কর্মচারী খাটে। আমি এক বগ্গা এক

ধরনের মাল আনা পছন্দ করি না। স্বামীকে বলি, আসল দোকান থেকে জিনিস আনা দরকার। নইলে আমরা পুরোনো আর একঘেয়ে হয়ে যাব খদ্দেরের কাছে। দামও পড়বে বেশি। আর পাইকাররাও আমাদের ঠকায়।

আমার স্বামী আগের মতো অলস নেই। তিনি সদা-প্রস্তুত, তৎপর। আমাদের মাল আসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সরাসরি তাঁতি বা মিলের সঙ্গে আমাদের কারবার। আমার স্বামীকে তাই খুব বাইরে যেতে হয় আজকাল। দূরেও। তখন সকালে দোকানে থাকেন আমার শ্বশুর, বিকেলে আমি।

সেবার আমার স্বামী গেছেন দক্ষিণ ভারতে। এক ঝড়ের রাতে একা ঘরে শুয়ে হঠাৎ খুব বিগলিত স্বর শুনতে পেলাম।

শুনছিস!

শুনছি।

তোর সঙ্গে রোজ পিছু পিছু একটা ছেলে আসে। দেখেছিস তাকে?

চমকে উঠে বলি, না তো! কে ছেলে? কখন আসে?

ন্যাকা! জানে না! রোজ রাতে যখন দোকান থেকে ফিরিস তখন পিছু পিছু ওটা কে আসে? বুঝি না নাকি?

আমি দেখিনি কাউকে।

সুন্দর ছেলে। চিবিয়ে খা। পেট পুরে খা। সাধ মিটিয়ে খা। পাপ পুণ্য বলে দুনিয়ায় কিছু নেই। সতী না হাতি। সব ভাসিয়ে দে। খা।

আমার বুক ঢিবঢিব করছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ।

তোর এমন রূপ, তবু মেথরানির মতো সেজে থাকিস কেন? মাথায় চিরুনি নেই, সাজে বাহার নেই, যেন অলক্ষ্মী মূর্তি ঘরে এলেন। কেন রে বোকা মেয়ে, স্বামী ছাড়া আর বুঝি পুরুষমানুষ নেই?

চুপ করুন পিসিমা। শুনলেও পাপ হয়।

আহা, একেবারে সতী সাবিত্রী এলেন! সাজিস না কেন? ঠোঁটে একটু রং দিবি, চোখে কাজল টানবি, চুলটা পরিপাটি করে বাঁধবি, ভাল একখানা ঝলমলে শাড়ি পরবি, তবে না! যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটবি, চারদিকে ঢেউ উঠবে।

ছিঃ পিসিমা।

অত ছিছিকার করতে হবে না। অমন চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকে, বঞ্চিত করবি কেন রে ভাতারখাকি? পাপ টাপ বলে কিছু আছে নাকি? বরং শরীরকে বঞ্চিত করাই তো পাপ।

আর বলবেন না, আমি আর শুনতে চাই না।

পিসিমা খিলখিল করে ঠাণ্ডা হাসিতে ঘর ভরে দিলেন। সেই হাসির শীতলতায় আমার বুক হিম হয়ে গেল।

পরদিন দোকান থেকে যখন ফিরছি তখন পথঘাট কিছুটা নির্জন। এ সময়টায় মফস্বল শহরে বেশি লোক বাইরে থাকে না। হাঁটছি সামনের দিকে চেয়ে, মনটা পিছনদিকে। কেউ আসছে? কেউ কি সত্যিই পিছু নেয় আমার?

আচমকা পিছু ফিরে চাইলাম। আর তখনই দেখতে পেলাম তাকে। লম্বা, দীঘল চেহারার একটা ছেলে। পরনে পায়জামা আর পানজাবি। এলোমেলো একরাশ চুল মাথায়। অল্প একটু দাড়ি। পাশের দোকানের উজ্জ্বল

আলোর ভিতর দিয়ে আসছিল বলে তার মুখখানা স্পষ্ট দেখলাম। আমার স্বামী সুপুরুষ বটে, এরকম মায়াবী চেহারা তাঁর নয়। তাঁর চেহারায় জমিদারির আভিজাত্য প্রবল। এ যেন কবিতার মতো। কী দীঘল হরিণের মতো দুখানা চোখ। কী মিষ্টি এর দুখানা ঠোঁট! সে আমার দিকেই চেয়ে খুব ধীর পায়ে হেঁটে আসছিল।

উত্তাল বুকে আমি প্রায় ছুটে পথটা পার হয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

নিশুত রাতে পিসিমা বললেন, দেখলি?

ছিঃ পিসিমা।

ওরে শোন, ঘরের পুরুষ তো জলভাত। আটপৌরে কাপড়ের মতো। হাগো, মোতো, খাও, ভেঁড়েমুষে পরো। কিন্তু এসব পুরুষ হল বালুচরী বেনারসী। মাঝে মাঝে চাখতে হয়।

ছিঃ।

অমন রূপে কি একজনের নৈবেদ্য সাজাবি? তুই কী রে? দেব দেবীরাও কত কী করে বেড়াত। পড় না মহাভারতখানা, দেখবি। শরীর হল নদীর মতো, সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ধরা না পড়লেই হল। শরীর তো আর নালিশ করবে না।

আমার চোখে জল এল।

পরদিন আমি দোকানের একজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম একবারও পিছু ফিরে তাকাইনি। দিন তিনেক এরকম চলল। চারদিনের দিন ফের একা ফিরছিলাম। পাহারাদার নেওয়ার কোনও মানেই হয় না। ছেলেটা তো আর আমাকে আক্রমণ করবে না। পিছু নিলে নেবে।

কয়েক পা যেতে না যেতেই আমি টের পেলাম, পিছনে কেউ আসছে। সে-ই কি?

ঠিক আন্দাজমতো জায়গায় আমি মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। সে-ই। আজও তার মুখে আলো পড়েছিল। বুকের ভিতরটা এমন ধক ধক করতে লাগল কেন যে!

না, আমি আজ আর ছুটলাম না। একটু কাঁপা বুক নিয়ে স্বাভাবিক হেঁটে ফিরে এলাম।

নিশুত রাতে পিসিমার বিগলিত কণ্ঠস্বর বলল, ভাল নয়? তোকে বলেছিলাম কিনা! অত লজ্জা কিসের তোর? অত তাড়াই বা কিসের? একটু ঢং করে করে হাঁটবি, মুচকি একটু হাসবি, চোখে একটু ইশারা করবি। তুই যে কিছুই শিখিসনি বোকা মেয়ে। রোজকার ভ্যাতভ্যাতে ওই একটা মাত্র আলুনি পুরুষ তোর ভাল লাগে? ভগবান তাহলে তোকে এত দিলেন কেন? এত রূপ, এত গুণ, চোখে এত দেয়ালা। একবার ডুব দিয়ে দেখ না।

আপনি কি আমাকে ছাড়বেন না পিসিমা? আমি কী দোষ করেছি?

বড় বড় কথা বলিসনি লো সাতভাতারি। ঢের চেনা আছে।

সাত দিনের মাথায় আমি আর থাকতে পারিনি। দোকান থেকে ফিরছি। একা। যখন টের পেলাম সে আজও আসছে, তখন হঠাৎ আমার সারা শরীরে রিমঝিম করে উঠল রাগ। আমি ঝটকা মেরে ঘুরে দাঁড়ালাম। ছেলেটাও থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কড়া গলায় ধমক দিয়ে বললাম, কী চান বলুন তো! রোজ পিছু নেন কেন?

ছেলেটা এত ঘাবড়ে গেল যে, বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল শুধু। তারপর অস্ফুট স্বরে কী একটা বলে মাথা নিচু করে দ্রুত পায়ে পালিয়ে গেল।

আমার বয়স মাত্র বাইশ। ডগমগে যুবতী। কিন্তু সংসারের জন্য ভেবে ভেবে, আর নানা কাজে জড়িয়ে বয়সের কথা ভুলেই ছিলাম। যেন সাত বুড়ির এক বুড়ি। রূপের কথা ভাবি না, সাজের কথা ভাবি না, কটাক্ষ নেই। একটা মানুষকে ঘিরেই যেন আমার লতিয়ে ওঠা। কিন্তু আজ বয়স যেন ডাক দিল। ডাক দিল আমার বিস্মৃত যৌবন। আমার রূপ ফুঁসে উঠে যেন আমাকে বলল, আমরা কি বৃথা ফিরে যাব?

পিসিমা নিশুত রাতে এসে বলল আর্লাপ:করলি বুঝি?

না। আমি ওকে ধমকে দিয়েছি।

পিসিমা খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, বেশ করেছিস। প্রথম প্রথম একটু কড়া হওয়া ভাল। তাতেই হামলে পড়বে। যা হ্যাংলা হয় পুরুষেরা! আস্তে আস্তে সুতো ছাড়বি। খেলিয়ে খেলিয়ে তুলবি। তারপর ঘরে এনে কপাট বন্ধ করে চিবিয়ে খা। ছিবড়ে করে ফেল।

আমি কানে হাত চাপা দিলাম।

অনেক সতী দেখেছি লো। পেটে খিদে মুখে লাজ। কাল সবুজ রেশমের কাপড়খানা পরিস। বেশ দেখায় তোকে। অত ডগডগে করে সিঁদুর দিস কেন? একটু এয়োর চিহ্ন রাখলেই হয়।

আপনি যান পিসিমা।

কেন যাব? তোর বাপেরটা খাই না পরি? ওরে শোন, শ্রীরাধিকাও তোর চেয়ে কম ছিল না। তা বলে কি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ফস্টি নস্টি করত না? দোষ হলে করত ওরকম?

আমার বুকে কেমন জ্বালা করছিল। সারা রাত আমি চেয়ে জেগে রইলাম। ছেলেটা কী চায়? কেন আসে?

পরদিনও ছেলেটা পিছু নিল। তবে অনেক দূর থেকে। তাকে আমি দেখতে পেলাম। আমার কান্না পাচ্ছিল। কেন কষ্ট করছে ছেলেটা? কেন অপমান সইতে আসে? কী লাভ ওর?

দুদিন পর একটু বৃষ্টি হল। গ্রীষ্ম শেষের প্রথম বৃষ্টি। পথঘাট ভিজল। বাতাস ঠাণ্ডা হল।

মেঘ কেটে অপরূপ এক চাঁদ উঠল আকাশে। রোজকার চাঁদ নয়। এ যেন রূপকথার জগৎ থেকে আমাদের আকাশে ভেসে এল। গাছের পাতায়, ভেজা পথে, ছোটো ছোটো জমা জলের গর্তে ছড়িয়ে দিল হাজারো টুকরো।

পথে পা দিয়েই আমি বুঝলাম, আজ বড় মাতাল দিন। আজ যেন বাঁধ মানছে না সুন্দর। আজ বড় বাড়াবাড়ি। আজ উতরোল হাওয়া। আজ কেউ বশ মানছে না যেন। আজ সব ওলটপালট। আজ কোন কারিগর পুরোনো পৃথিবীর সব মালমশলা নতুন করে ছেনে মেখে গড়েছে অন্য একটা জগৎ। আকাশে এত তারা তো থাকে না কখনও? আমি কি উড়ে যাচ্ছি হাওয়ায়, জ্যোৎস্নায়?

আমি আজ নরম করে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, পিছনের পথে কেউ নেই। সে আজ পিছু নেয়নি আমার? এই জ্যোৎস্নার পাগল রাতে সে এল না বুঝি? আজ যেন আমারও একটু প্রতীক্ষা ছিল! মনটা একটু ম্লান আর বিস্বাদ হয়ে গেল কি? অভ্যাস তো!

আমি শূন্য পথটাকে একটা অস্পষ্ট ধিক্কার দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটছিলাম। আস্তেই হাঁটা যাক। হয়তো সে আসবে। হয়তো সময় যায়নি।

সে পিছনে ছিল না। ছিল সামনে। হঠাৎ আমাকে আপাদমস্তক চমকে দিয়ে সে নির্জন পথে আমার পথ জুড়ে দাঁড়াল। দীঘল চেহারা, দুটি অপরূপ হরিণের চোখ, মাথায় মস্ত চাঁদ। আমি মুগ্ধ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে

পড়েছি কখন! লজ্জাহীন চোখে তাকিয়ে আছি। দুটি চোখে কী গভীর মায়া! দুটি ঠোঁটে কী অফুরান আকুলতা!

সে আমার দিকে অপলক চেয়ে ছিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধতাই তরঙ্গ তুলে যাতায়াত করছিল দুজনের মধ্যে।

সে হঠাৎ স্খলিত কণ্ঠে বলল, আমি... আমি তোমাকে ভালবাসি।

তারপর আর সে দাঁড়াতে পারল না। একটা ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সে দ্রুত ভীত পায়ে উধাও হয়ে গেল। জবাব চাইল না। তাকে আমার জবাব দেওয়ারও কিছু ছিল না হয়তো। কিন্তু আমার ভিতরে যে ভেঙে পড়ছে ইমারত! ধসে পড়ছে পাহাড় পর্বত! হারিয়ে যাচ্ছে পথ!

খুব ধীর পায়ে, যেন কোথাও যাচ্ছি না, কোনওদিন পৌঁছব না কোথাও, এরকমভাবে হেঁটে আমি বাড়ি ফিরলাম। বাড়ির দরজাটা চিনতে পর্যন্ত সময় লাগল। এই কি আমার ঘরবাড়ি? এই কি আমার ঠিকানা?

বালিশ ভিজিয়ে কাঁদলাম রাতে।

পিসিমা প্রগাঢ় স্বরে বললেন, কাঁদ! কাঁদলে অনেক ময়লা কেটে যায়। ধর্মকর্ম বারব্রত জাত ধর্ম ওসব হল ময়লা। সব পরিষ্কার হয়ে যাক। তারপর গাঙ্ পেরিয়ে যা। কত সুখ, দেখবি।

সুখ পিসিমা! আমার যে ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছে।

খাক হয়ে যাক। পুড়ে যাক জঞ্জাল।

আমি সারা রাত জ্বালা-ধরা চোখে অন্ধকারে চেয়ে রইলাম।

পরদিন ভোরবেলা উঠে সদর দরজাটি খুলতেই দেখি দরজার বাইরে চৌকাঠের পাশটিতে কে একটি বৃষ্টিভেজা রক্তগোলাপ রেখে গেছে। কয়েকটা সবুজ পাতা আর ডাঁটিশুদ্ধু। তখনও ফোটেনি। আধফোটা।

আমি ফুলটা তুলে নিলাম। এনে জলে ভিজিয়ে সাজিয়ে রাখলাম ঘরে। ফুটুক। ফুলটা ফুটুক।

প্রতিদিন পিছু নিত সে। প্রতি সকালেই রেখে যেত রক্তগোলাপ। আমার কি পাপ হল? আমি কি মনে মনে আমার শক্ত বাঁধন কেটে নৌকো ভাসালাম পাগলা স্রোতে?

ভোরবেলা একদিন আমার ক্লান্ত স্বামী ফিরলেন। দরজা খুলে আমি অবাক বিস্ময়ে বললাম, আপনি! কোথায় ছিলেন আপনি এতদিন? কেন ছেড়ে থাকেন আমাকে?

বলতে বলতে আমি কেঁদে ফেললাম। বারবার মাথা ঠুকতে লাগলাম ওঁর বুকে।

উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আরে, কী কাণ্ড! কেঁদো না, কেঁদো না। আমি তো কাজেই গিয়েছিলাম।

আপনি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না আর।

রক্তগোলাপটি আজও রাখা ছিল চৌকাঠে। আমার স্বামী না দেখে সেটিকে পদপিষ্ট করে চৌকাঠ ডিঙিয়ে এলেন।

আজ আর আমি গোলাপটি তুলে নিলাম না।

রাতে আমি নতুন চাদর পাতলাম বিছানায়। পরিপাটি করে পেতে দিলাম বালিশ। ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিলাম। একটু সুগন্ধও।

উনি শুতে এসে বিছানার দিকে চেয়ে বললেন, আজ কি ফুলশয্যা?

আমি তৃষিতের মতো তাঁকে আলিঙ্গন করলাম। অস্ফুট স্বরে বললাম, আমাকে দিন।

কী কাণ্ড লতা? আমার সবই তো তোমার।

আমি আপনাকে আরও চাই। আরও চাই। আপনাকে দিন।

ঘরের চারদিকে অশান্ত এক কণ্ঠস্বর ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাপ করলি না? অভিসার হল না তোর? ওলাউঠা হয়ে মর সান্নিপাতিক হয়ে মর। আমি কালসাপ হয়ে তোর বরকে খাব। মরবি, মরবি।

আমি আমার স্বামীকে আকর্ষণ করলাম বিছানায়। আমি আর দেরি করতে পারি না। আমার চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে তাপে।

কণ্ঠস্বর অভিশাপ দিচ্ছে, খা... খা... খা... খা... খা... খা...

আমি চোখ বুজে স্বামীকে শক্ত করে ধরলাম বুকে। অধরে অধর। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, স্তব্ধ হও প্ররোচনা, শান্ত হও তাপিত হৃদয়। জন্ম নাও। জন্ম নাও জন্মের যন্ত্রণা। জন্ম নাও আমাদের ভিতর দিয়ে। শীতল হও, জুড়িয়ে যাও...

বাইরে আমাদের ঘরের চারপাশে শব্দটা ঘুরছে আর ঘুরছে, খা... খা... খা... খা... খা...

আমি বললাম, নিবে যাক বুকের আগুন, শান্ত হোক কামনার জ্বালা, আত্মদমনের যত ক্লেশ। শান্ত হও। এ তোমার জন্মের সময়। শান্ত হও, এ বড় সুন্দর মুহূর্ত। কোল জুড়ে এসো তুমি, বুক জুড়ে এসো। জন্ম নাও... জন্ম নাও... জন্ম নাও...

শব্দ মিলিয়ে গেল। চিরকালের মতো। সম্পূর্ণ হল আমাদের মিলন।

দশ মাস পর আমার মেয়ে হল। বসন্ত কালে তার জন্ম বলে আমরা তার নাম রাখলাম বসন।

বাড়ির কোথাও পিসিমার ছায়া নেই। শব্দ নেই। বাড়ি শান্ত। ভারমুক্ত।

আমি বার বার বসনকে এসে দেখি। সে যেন এক রাশি ফুলের মতো বিছানায় শুয়ে থাকে। এত তার রূপ! আমি তাকে আদর করতে করতে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি, চিনতে পারো আমায়? চেননা এই বাড়ি? মনে পড়ে না?

অবোধ শিশু চেয়ে থাকে।

অনেকদিন বাদে এ বাড়িতে একটি শিশু জন্মাল। তাকে নিয়ে যে টানাহ্যাঁচড়া তা বলার নয়। শাশুড়ি জপতপ প্রায় ছেড়েই দিয়ে নাতনী নিয়ে পড়ে থাকেন। শ্বশুরমশাই মাঝে মাঝেই দোকানে কামাই দিতে লাগলেন। জ্যাঠাশ্বশুর নীচের ঘরে বড় একটা আসতেন না। আজকাল দুবেলা ঘন ঘন যাতায়াত। ভাসুর ভাইঝি পেয়ে এত মুগ্ধ যে, খেলনায় ঘর ভরে ফেলতে লাগলেন। বসনের সময় কাটে কোলে কোলে, আদরে আদরে। তাকে কেউ এক মিনিট ছাড়তে চায় না বলে সে হামা দেওয়া শিখতে পারল না সময়মতো। হাঁটতে শিখল আরও দেরিতে।

বসনকে দেখতেও এলেন না আমার জা। তিনি নীচে নামতে পারেন না। বাত ব্লাডপ্রেশার আরও নানা উপসর্গ নিরানন্দে ঘিরে আছে তাঁকে।

বসন যখন একটু একটু হাঁটতে শিখল তখন একদিন সবার অজান্তে কোন ফাঁকে দুপুরবেলা সিঁড়ি দিয়ে টুক টুক করে ওপরে উঠে গিয়েছিল। তারপর টলোমলো পায়ে সে আমার জায়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। মুখে আঙুল পুরে পরম বিস্ময়ে দেখতে লাগল জাকে।

জা বসনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কে? কে রে?

বুঝতে বোধহয় একটু সময় লেগেছিল তাঁর। এ হল সেই ডাইনীর মেয়ে। তিনি বিছানা থেকেই হাত নেড়ে তাড়িয়ে দিলেন, যা, যা, যা চলে যা এখান থেকে।

কোথায় অভিপ্রেত তারা, কোথায় নয় এটা বাচ্চারা ভালই বোঝে। বসন তাড়া খেয়ে ভয় পেয়ে ফিরে আসতে গেল। কিন্তু নামতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। সিঁড়ি থেকে হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল সে। সিঁড়ির পর সিঁড়ি।

কোথা থেকে অচল শরীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ এল কে জানে, জা প্রায় উড়ে এলেন তাঁর বিছানা ছেড়ে। ছয় সিঁড়ি নীচে নেমে তুলে নিলেন বসনকে। ব্যথায় নীলবর্ণ হয়ে গিয়েছিল বসন।

শব্দ পেয়ে পাঁচু যখন ওপরে গেল, তখন জা বসনকে কোলে নিয়ে কাঁদছেন। জলপট্টি দিচ্ছেন ব্যথার জায়গায়।

বাড়ি ছিলাম না। দুপুরে ফিরে শাশুড়ির কাছে ঘটনাটা শুনলাম। উনি মুখ চুন করে বললেন, বড্ড দামাল হয়েছে মেয়েটা। একটু চান করতে গেছি সেই ফাঁকে ওপরে গিয়েছিল। তারপর কী কাণ্ড।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, দিদির ঘরে?

হ্যাঁ মা। এখনও সেই ঘরে আছে। কী হচ্ছে কে জানে? তোমার জায়ের তো বুকে অনেক বিষ। পাঁচুকে পাঠিয়ে মেয়েটিকে আনিয়ে নাও।

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললাম, থাক মা।

ঠাকুর এসে বলল, বড় বউদি বসনকে ভাত খাওয়াবেন বলে ভাত চেয়ে পাঠালেন। নিয়ে যাব?

আমি বললাম, যাও।

এর পর থেকে বসন রোজ ওপরে যেত বড়মার কাছে। কাউকে জয় করতেই সে বাকি রাখল না।

আমি তাকে একা পেলে এখনও তার মুখে চিহ্ন খুঁজি। তাকে বলি, মনে পড়ে না গয়নার বাক্স? মনে পড়ে না জ্বালা যন্ত্রণা? মনে পড়ে না তোর?

বসন দুর্বোধ্য নানা শব্দ করে কী বলে কে জানে!

॥ বসন ॥

তিনতলার ঘরগুলো যে কেমন হু-হু করে তা আমি বোঝাতে পারব না। তিনখানা মস্ত ঘর নিয়ে আমি একা থাকি। এই একা থাকা আমার মা একটুও পছন্দ করে না। একটা দরদালান আর তিন তিনটে প্রকাণ্ড লোভনীয় ঘর বহুকাল ফাঁকা পড়ে ছিল। ঝাড়পোঁছ, ঝাঁটপাট হত, আবার তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকত। আমি বায়না ধরলাম, তিনতলায় থাকব।

অনেক বারণ, বকাঝকা হল। তারপর পেয়েও গেলাম তিনখানা ঘর নিয়ে আমার রাজত্ব। পাছে ভয় পাই সেইজন্য প্রথম প্রথম মা বা বড়মা এসে থাকত আমার সঙ্গে। কিন্তু আমার ভয় করে না তো! একা থাকতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আমি টের পাই, তিনখানা ঘর আর দরদালানের ভিতরে এক অদ্ভুত নির্জনতা হুহু করে সারাদিন বয়ে যায়। বাতাসের শব্দ নয়, তবু কী যে হুহু করে তা কে জানে!

তিনটে ঘরে মেলা আসবাব। বিশাল ভারী পালঙ্ক, বড় বড় কাঠের কয়েকটা আলমারি, পাথর-টপ টেবিল, দেয়ালে পেণ্ডুলামওলা মস্ত ঘড়ি। একটা কাচের আলমারিতে সাজানো আছে বিলিতি পুতুল। এসবই আমার এক ঠাকুমার। আমার জন্মের আগেই মারা যান। কী দুঃখের জীবন ছিল তাঁর! সাত বছর বয়সে বিয়ে, বারো বছর বয়সে বিধবা। আমি ভাগ্যিস সে যুগে জন্মাইনি! কী বিচ্ছিরি সিস্টেম ছিল বাবা! আজকালকার মেয়েরা কি আর সাধে নারী-মুক্তি আন্দোলন করে?

আমার বন্ধুরা মাঝে মাঝে আড্ডা মারতে চলে আসে আমার কাছে। তিনতলায় এত বড় জায়গা নিয়ে আমি থাকি বলে তারা খুব অবাক হয়। একটু হিংসেও করে কেউ কেউ। আর কেউ কেউ বলে, ও বাবা এ ঘরে একা থাকতে হলে আমি ভূতের ভয়েই মরে যাব। তুই যে কী করে থাকিস! বুকের পাটা আছে বাবা।

সেদিন খুব আড্ডা হচ্ছিল। হঠাৎ চঞ্চল বলল, এই দ্যাখ বসন, তোকে কিন্তু কিডন্যাপ করা হতে পারে।

আমি অবাক হয়ে বলি, কিডন্যাপ করবে? কে করবে রে?

আমার হঠাৎ তোর কথা ভেবে কালকে মনে হল, আরে, বসনটা তো দারুণ টারগেট। ওদের এত টাকা, আর বসন এত আদরের মেয়ে। দিনকাল যা পড়েছে বসনকে কিডন্যাপ করতেই পারে বদমাশরা।

ইন্দ্রাণী বলে, কিডন্যাপ ফিডন্যাপ করবে না। বসনের আসল ভয় অন্য জায়গায়।

কোন জায়গায়?

ওকে বিয়ে করলে তো একটা রাজত্বই পেয়ে যাবে পাত্রপক্ষ। তাই ওকে বিয়ে করতে অনেকে হামলে পড়বে।

কথাটা খুব মিথ্যেও নয়। আমার জ্যেঠুর ছেলেপুলে নেই। বাবা-মার আমি একমাত্র সন্তান। আমি সবই পাব।

তিলক বলে, ডি কে সি কী আর ওকে সাধে বিয়ে করতে চেয়েছিল! না রে বসন, তোর খুব কেয়ারফুল থাকা দরকার।

এমন মুরুব্বির মতো বলল যে আমরা হেসে ফেললাম। আমি বললাম, মারব থাপ্পড়! সবাই বুঝি কেবল আমাকে টাকার জন্য বিয়ে করতে চায়? আর কিছু নয়?

ঝিনুক বলে, তোর মাইরি বই একটু বেশি বেশি আছে। ভগবানের বিচারটাই এমনি।

বাচ্চু নির্বিকার মুখে বলে, বসনটা এমনিতে সুন্দর তবে ওসব ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্য এ যুগে চলে না।

আমি অবাক হয়ে বলি, সে কী রে, আমি অচল?

বাচ্চু বিজ্ঞের মতো বলে, তা বলছি না। তবে ওসব টানা টানা চোখ, টোপা টোপা গাল, কোঁকড়া চুল জমিদার মাকা চেহারার কদর নেই। এখনকার টেস্ট আলাদা। দেখিস না হনু উঁচু, গাল বসা, চোখ গর্তে ঢোকানো চেহারার মেয়েদের আজকাল বেছে বেছে সিনেমার নায়িকা করা হচ্ছে।

তিলক বিরক্ত হয়ে বলে, রাখ তো। চেহারা নিয়ে আলোচনাটা বিলো ডিগনিটি। চেহারা জিনিসটাই স্কিন-ডীপ। আসল জিনিস হল পারসোনালিটি।

বন্ধুদের আড্ডা থেকে আমি মনে মনে দূরে সরে যাই। আমি আমার কথা ভাবতে থাকি। আমার এত বেশি আছে কেন? টাকাপয়সা, রূপ, আদর। আমি কি একটু হাঁফিয়ে উঠি? জ্যেঠু, বাবা, ঠাকুমা, বড়মা সকলের নজর সবসময়ে আমার ওপর। আমার দুজন দাদু ছিল। বড় আর ছোটো। দুজনে মিলে আমার মাথা খেয়েছিল আরও বেশি। দুজনেই মারা গেল এক বছরের তফাতে। তবু কি আদর কমছে? একটুও না।

শুধু মা একটু আলাদা। মা ভালবাসে খুব, কিন্তু আসকারা দেয় না। আমার মা কিছু অদ্ভুত। আমার সঙ্গে আমার মায়ের কিছুই মেলে না।

বন্ধুরাও বলে, তোর মা খুব অদ্ভুত, তাই না? এখনও কী রকম পতি ভক্তি!

একথা ঠিক, আমার বন্ধুদের কারও মা বাবার মধ্যেই এমন মিল নেই। বাবাকে মা এত বেশি ভক্তি করে, এত বেশি শ্রদ্ধা করে, আপনি-আজ্ঞে করে, যা আমি কখনও পারব না। অথচ এই সেকেলে মহিলাই গোটা পরিবারটাকে কী নিপুণ দক্ষতায় চালায়। শুনেছি, আমাদের দু-দুটো দোকানের পিছনে মায়েরই চেষ্টা আর পরিশ্রম ছিল। আজ আমাদের যে ফলাও অবস্থা তাও মায়েরই দূরদৃষ্টির ফল। এ সংসার মায়ের কথায় ওঠে-বসে। এক ভেঙেপড়া অবস্থা থেকে মা ধীরে ধীরে এই সংসারটাকে টেনে তুলেছে।

আমার মা যে আমার বাবাকে আপনি-আজ্ঞে করে সেটা আমার কানে অস্বাভাবিক ঠেকত না। কারণ, ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। কিন্তু বন্ধুদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে। তারা জিজ্ঞেস করে, মাসীমা কেন মেসোমশাইকে আপনি করে বলে রে?

আমার লজ্জা করে তখন। মাকে জিজ্ঞেস করি, কেন বাবাকে আপনি বলো মা?

মা জবাব দেয়, বয়সে বড় ছিলেন, ব্যক্তিত্ববান ছিলেন। আপনিটাই এল মুখে। তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি কিন্তু।

সকলেরই কি স্বামীকে আপনি বলা উচিত?

তা কেন? যার যেটা ভাল লাগে বলবে। তবে আমি ওঁকে চিরকাল শ্রদ্ধা করেছি বলেই কত জোর পেয়েছি। নইলে সব ভেসে যেত।

একথাটা আমি বুঝতে পারি না। মাকে আর জিজ্ঞেসও করি না কিছু। এ বাড়ির ভিতরে এখনও একটা পুরোনো বনেদি হাওয়া বন্ধ হয়ে আছে। বাইরের পৃথিবী কত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে!

তিনতলার ঘরে আজ সকালে আমার ঘুম যখন ভাঙল তখন পূবের জানালা দিয়ে শীতের রোদ ঘর ভাসিয়ে দিচ্ছে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও আমার মাথায় ভরে আছে কাল রাতের জ্যোৎস্না, নির্জনতা।

মুখটুখ ধুয়ে নীচে নামতে যাচ্ছি বড়মা উঠে এল ওপরে। বাতের হাঁটু নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে বড়মার কষ্ট হয়। হাঁফাচ্ছে।

বললাম, কেন বড়মা, কষ্ট করে ওপরে ওঠো। সিঁড়ির মুখ থেকে ডাকলেই তো শুনতে পাই।

মুখপুড়ি, কাল রাতে চাটুজ্জে বাড়ির বউটাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী বলছিলি?

হেসে ফেলি, বেশ করেছি বলেছি। ওরা বউটাকে এত কষ্ট দেয় কেন?

অন্য বাড়ির ব্যাপার নিয়ে তোর মাথা ঘামানোর কী দরকার? শেষে একটা ঝগড়া বাধাবি নাকি? চেঁচিয়ে বলছিলি, পাড়াশুদ্ধু শুনেছে। ছিঃ মা, ওরকম বলতে নেই।

আমার খুব ইচ্ছে হয়, বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে এনে ওদের বাড়িতে একদিন হামলা করি।

সে তুমি পারো মা, তোমার অসাধ্য কিছু নেই। শুনলাম কাল নাকি লরিও ঠেলেছিস!

না ঠেললে যে সারা রাত পথে পড়ে থাকতে হত।

বড়মা চোখ বড় করে বলে, আর কী বাকি রইল? মেয়েরা লরি ঠেলে এই প্রথম শুনলাম।

এ কি তোমাদের আমল বড়মা? এ যুগের মেয়েরা সব পারে।

সব পেরো মা, সব পেরো। শুধু দয়া করে মেয়ে থেকো। ব্যাটাছেলে হয়ে যেও না। যা রকম সকম দেখছি, এরপর মেয়েদের গোঁফদাড়ি না গজালে বাঁচি।

আমি হাসি চাপতে পারলাম না। বললাম, কী যে সব বলল না, বড়মা? এ যুগের মেয়েদের তোমার খুব হিংসে হয়, না?

তা একটু হয়। এই বলে বড়মা আঁচলের আড়ালে থেকে একটা ছোট্ট রেকাবি বের করে বলল, এ দুটো খেয়ে নে তো। টাটকা করেছি।

দেখি, গোকুল পিঠে। আপনা থেকেই নাক কুঁচকে আসছিল। দু চক্ষে দেখতে পারি না পিঠে-পায়েস। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করার উপায় আছে? শুধু বললাম, আমাকে মুটকি আর ধুমসি না বানালে তোমার সুখ নেই, না?

ওমা! কথা শোনো! মুটকি কেন হতে যাবি।

যাব না? মিষ্টি বেশি খেলে ক্যালোরি ইনটেক কত বেড়ে যায় জানো।

জন্মে শুনিনি। খা। শীতকালে একটু খেতে হয়। আজ পৌষ পার্বণ।

আমার কী পছন্দ জানো?

খুব জানি। ওই কেঁচোর মতো কিলবিলে জিনিস আর গোপালের ঝাল সিঙ্গাড়া। ওইসব খেয়েই তো চেহারা হাড়গিলে হচ্ছে।

হাড়গিলেদেরই আজকাল কদর। হাঁ করছি, মুখে দিয়ে দাও। রসের জিনিস আমি হাতে ধরব না। হাত চটচট করবে।

বড় করে হাঁ কর। গরম কিন্তু। বিষম খাস না আবার।

বলতে নেই, মায়ের চেয়ে বড়মার সঙ্গেই আমার বেশি মাখামাখি। বড়মা খোলামেলা, কথা চেপে রাখতে পারে না। তার আদরের মধ্যে জোর করে খাওয়ানো, শরীর নিয়ে চেঁচামেচি, মেয়েদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মতামত সবই আছে। তবু বড়মাকে আমি যখন তখন পটিয়ে ফেলতে পারি। যে কোনও আবদার করে আদায় করতে পারি।

বছর দেড়েক আগে জ্যেঠু যখন আমাকে স্কুটার কিনে দেয় তখন বড়মার মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। জ্যেঠুর সঙ্গে তুমুল বাকবিতণ্ডাও হয়েছিল। এমন কাণ্ড নাকি বড়মা কখনও দেখেনি। পরে সেই বড়মাকেই আজকাল আমি স্কুটারের পিছনে চাপিয়ে এখানে সেখানে নিয়ে যাই।

বড়মা বলে, তুই আসলে ব্যাটাছেলেই। ভুল করে মেয়ে হয়ে জন্মেছিস।

বড়মা জানে না, আমি কী ভীষণ মেয়ে। আমি মেয়ে বলে আমার একটুও দুঃখ নেই। যা বড়মার হয়তো বা আছে। মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে আমি ভীষণ খুশি। যদি জন্মান্তর থাকে আমি বারবার মেয়ে হয়েই জন্মাতে চাই। আমি তো চাই পৃথিবীটা শুধু মেয়েদের হোক। পুরুষ থাকার কোনও দরকার নেই। শুধু মেয়েদেরই পৃথিবী হলে কী ভাল হত! না, তা বলে বাবা, জ্যেঠু আর আমার দুটো দাদুকে বাদ দিয়ে নয়। পুরুষ বলতে পৃথিবীতে থাকবে শুধু ওই চারজন। বাবা, জ্যেঠু, দুটো দাদু। ব্যস।

আজ ছুটি। আজ আমার অনেক প্রোগ্রাম। গান শিখতে যাব, শর্বরীদের বাড়িতে যাব আবার দুটো সায়েন্সের খাতা আনতে, সুমিতা আমার একটা কার্ডিগান বুনছে—সেটার ডিজাইনটা একটু বদলাতে বলে আসতে হবে।

নীচে নামতেই ডাকল, বসন, জলখাবার খেয়ে একবার আমার ঘরে এসো।

গলাটা কি একটু গম্ভীর শোনাল? আমার মা একটু গম্ভীর।

মায়ের ঘরটা এঁদো, অন্ধকার, বিচ্ছিরি। তার মধ্যে আবার বাক্স প্যাঁটরা, সিন্দুক কত কী। খাটে বড়মা পা ঝুলিয়ে বসে। সিন্দুকের সামনে মা। মায়ের সামনে মেঝেতে রাখা একটা মস্ত গয়নার বাক্স।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসো।

আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মা অদ্ভুত এক চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, এই বাক্সটা চিনতে পারো? কিছু মনে পড়ে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না তো! কী মনে পড়বে?

এই বাক্সটা একদিন তোমার ছিল।

আমি অনিচ্ছেয় মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, কই জানি না তো!

হয়তো এ জন্মে নয়।

আমি বিস্ময়ে মায়ের মুখের দিকে চাইলাম। আমার মা বাস্তব জগতের মানুষ। কখনও উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুনি না। কিন্তু একথাটার কী মানে হয়!

তবে কি আর জন্মে?

বড়মা বিরক্ত হয়ে মাকে বলল, তোর অত ভেঙে বলার দরকারটা কী? বড্ড বোকা তুই।

মা বাক্সর ডালাটা খুলে বলল, দেখ। দেখে নাও।

দেখলাম বাক্সটা ভর্তি মোটা মোটা ভারী ভারী সব পুরোনো গয়না। দেখলে গা বমি-বমি করে। কী বিচ্ছিরি সব জিনিস!

বললাম, দেখার কী আছে। ও তো পুরোনো সব গয়না।

একশ ভরির ওপর। এক রত্তিও এদিক ওদিক হয়নি।

আচ্ছা মা, সকালেই আজ গয়না নিয়ে পড়লে কেন? আমার নিজেরও তো অনেক আছে। পরি কি? গয়না টয়না আমার একদম ভাল লাগে না।

আমার একটা দায়িত্ব ছিল। তাই দেখালাম।

ওসব গয়না কার? তোমার বিয়ের?

না।এসবই তোমার।

আমার চাই না। রেখে দাও।

মায়ের মুখটা এই অন্ধকার ঘরেও হঠাৎ উজ্জ্বল দেখলাম। একটা যেন বদ্ধ উদ্বিগ্ন শ্বাসও ছাড়ল মা।

বড়মা বলল, তোর নাটুকেপনা একটু বন্ধ করবি লতা? মাঝে মাঝে যে তোর মাথায় কী পাগলামি চাপে! ও একরত্তি মেয়ে, আজকালকার ওরা কি ওসব গয়নার দাম দেয়? তুই ক্ষিতীশ স্যাকরাকে ডেকে নতুন করে গড়তে দে কয়েকটা। বেশি করে করার দরকার নেই। স্যাঁকরাদের ঘরের সোনা বেশি না দেখানোই ভাল।

আজকের সকালের নাটকটা কিছু বুঝতে পারছি না আমি। দুজনের মুখের দিকে ঘুরে ঘুরে দেখছি। কী মানে হয় এসব কথার?

মা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে কেন? কী দেখছে আমার মুখে? আমি তো নতুন কেউ নই!

মা বলল, তোমার অনুমতি নিয়ে আজ বাক্সটা বের করলাম।

আমার অনুমতি! কেন মা? ও গয়না তো আমি জন্মেও দেখিনি। ওটা কার?

মা মাথা নিচু করে বলল, এসব তোমাকে একজন দিয়ে গেছেন। এতদিন আমার কাছে গচ্ছিত ছিল মাত্র।

ও দিয়ে আমি কী করব? কে দিয়ে গেছে?

তোমার এক ঠাকুমা। দুঃখী মানুষ ছিলেন। এইসব গয়না ছিল তাঁর বুকের পাঁজর।

কে ঠাকুমা?

তুমি তাঁকে দেখোনি। রসময়ী।

আমি হাসলাম, ছবি দেখেছি। দারুণ সুন্দরী ছিলেন। আমি তো তাঁরই ঘরদোর বিছানা দখল করে আছি। না?

তুমি নিজের অধিকারেই আছ। দখল করতে যাবে কেন?

গয়নাগুলো আজই বের করলে কেন?

মা আর বড়মা নিজেদের মধ্যে একটু রহস্যময় চোখাচোখি করে নিলেন। খুব মৃদু একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম যেন!

আসছি মা। আমার অনেক কাজ আছে।

এসো।

মাথায় হেলমেট চাপিয়ে স্কুটারে ভেসে যেতে যে কী রোমান্টিক মাদকতা আছে কেউ বুঝবে না। ঝাঁঝালো ঠাণ্ডা বাতাস নাক মুখ দিয়ে ঢুকে মগজ থেকে গয়নাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। মা বড়মা এদের আমি

কিছুতেই বুঝতে পারি না। বড্ড সেকেলে। কেবল সোনাদানা, গয়না নিয়ে পড়ে থাকবে। পৃথিবীটা যে কত সুন্দর তা উপভোগ করে কই এরা?

দু জায়গায় ঘুরে, আড্ডা মেরে যখন সুমিতাদের বাড়ি পৌঁছলাম তখন দুপুর। স্কুটারটা স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ডাকলাম, সুমিতা, এই সুমিতা।

বাইরের ঘরে একটি শান্ত চেহারার দীর্ঘকায় পুরুষ বসে আছে সোফায়। অল্প একটু দাড়ি মুখে। মাথায় এলোমেলো চুল। উদাসীন মুখ। অনেক পাল্টে গেছে, তবু এ মুখ আমি ইহজন্মে ভুলব না। আমি থমকে গেলাম। কয়েক সেকেন্ডের জন্য থমকাল আমার হৃৎপিণ্ড। তারপরই কোন অতীত থেকে মার মার করে লুঠেরা সৈনিকদের মতো ছুটে এল অপমানের স্মৃতি।

এক গাঢ় গম্ভীর স্বর বলল, সুমিতা? সুমিতা বোধহয় ওপরে আছে।

আমি ঘরটা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম, কি করছি তা টের না পেয়েই।

সুমিতা উল ছড়িয়ে বিছানায় বসা। আলুথালু চেহারা। আমাকে দেখেই করুণ গলায় বলে উঠল, আজও হয়ে ওঠেনি রে! কী করব বল, পরশু দাদা এসেছে এতদিন বাদে। শুধু হৈ-চৈ হচ্ছে। কিছু করতে পারছি না। বোস না। দাদা তোকে দেখল?

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ।

কথা বললি?

কেন?

সুমিতা উলের কাঁটায় মন দিতে মাথা নিচু করে বলে, এমনি।

না এমনি নয়। ঘটনার ভিতর দিয়ে আমি একটা আবছা প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি। আমার ভিতরটা শক্ত হয়ে উঠছে। আমি রেগে যাচ্ছি। কিন্তু বলতে পারছি না।

সুমিতা মৃদু স্বরে বলল, এতদিন অমেরিকায় ছিল। কত কষ্ট করেছে বল। বিদেশে গিয়েও প্রথম দিকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে।

এসব শুনে আমার কোনও লাভ নেই। তাই চুপ করে বসে রইলাম।

সুমিতা বলে, কাল নাকি তোদের লরি খারাপ হয়েছিল রাস্তায়।

হ্যাঁ।

ইস, আমি এ বছর যেতে পারলাম না। দাদা এল তো। কী করে যাব বল! কথাই ফুরোচ্ছে না।

আজকাল দাদার সঙ্গে কথা বলিস? আগে তো ভয় পেতি।

তখন কি দাদা এরকম ছিল, না আমরাই ছিলাম! বড় হয়েছি না?

তোর দাদার অহংকার কমেছে?

সুমিতার মুখটা কালো হয়ে গেল।

একটু চুপ করে থেকে বলল, অহংকার! দাদার অহংকার করার মতো কী ছিল বল! খেতে পেতাম না আমরা, চেয়েচিন্তে চলত। দাদা এত লাজুক ছিল যে কোনওদিন কিছু মুখ ফুটে চাইতে পারত না। ওর খিদে পেলে আমরা কখনও টের পেতাম না। না রে, দাদা অনেক কষ্ট পেয়েছে।

ভাল।

তুই কি দাদাকে ওরকম ভাবিস?

আমি তো অমলেশদা সম্পর্কে কিছু জানি না, কী ভাবব?

তবে যে অহংকারের কথা বললি!

ভাল ছাত্র ছিলেন, অহংকার থাকতেই পারে।

ওরকম বলিস না রে! আমেরিকায় যা স্কলারশিপ পেত তার বেশির ভাগটাই পাঠিয়ে দিত আমাদের। নিজে আধপেটা খেয়ে থাকত। দিনরাত পড়ত।

ওসব শুনে আমার কী হবে?

দাদাকে কেউ কখনও খারাপ বলেনি রে!

কার্ডিগানটা হলে ওটা তুই আমাকে দিয়ে আসিস। শুধু হাতটা পুরো করিস না থ্রি কোয়াটার করিস।

সুমিতা মাথা নেড়ে বলে, ঠিক আছে। একটু দেরি হবে কিন্তু। দাদা আছে তো, তাই।

সুমিতা আমাকে এগিয়ে দিতে এল নীচে। স্কুটারে ওঠার আগে যখন হেলমেট পরছি তখন শুনলাম সুমিতা বারান্দা থেকে তার দাদাকে চাপা গলায় ডেকে বলল, দাদা, এই বসন।

গাঢ় স্বরটি বলল, জানি।

আজ বহুকাল বাদে সেই অপমান আমার সর্বাঙ্গে বেশ জলবিছুটির মতো জ্বলছে। বার বার দাঁতে দাঁত পিষে ফেলছি। স্কুটার আমি এত জোরে চালাইনি কখনও। কাছেই বাড়ি, মাত্র তিনটে বাড়ি পর। তবু এত জোরে স্কুটার ছেড়েছি যে সময়মতো থামতে পারলাম না। বেমক্কা ব্রেক কষলাম। স্কুটারটা সেই ধাক্কায় ঘোড়ার মতো লাফিয়ে উঠল। তারপর স্কুটার এক দিকে, আমি অন্যদিকে ছিটকে গেলাম। কী জোর লাগল বাঁ হাতটায়! চোখ ভরে এল জলে। রাস্তার অপমানশয্যা ছেড়ে যখন উঠলাম, তখন শরীরের চেয়েও ব্যথা অনেক বেশি হচ্ছিল মনে।

রাস্তায় লোক জড়ো হওয়ার আগেই স্কুটারটা টেনে তুলে আমি ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এলাম।

তিনতলায় আমার নির্জনতায় ফিরে এসে দেখলাম, বাঁ হাত কনুই পর্যন্ত ছড়ে ছত্রখান হয়েছে। রক্ত পড়ছে খুব। মাথাতেও লেগেছে, হেলমেট ছিল বলে ততটা নয়। কোমরেও কি বেশ চোট? হবে। কিন্তু সেসব আমাকে একটুও কাহিল করল না। আমি ঘরে এসে চুপ করে বসে রইলাম চেয়ারে। ভূতগ্রস্তের মতো। তিনতলায় ঘরদোরের সেই শ্রুতির অতীত কিছু একটা হু-হু, করে বয়ে যাচ্ছে। বড় বেশি হু-হু। বড় বেশি খাঁ-খাঁ।

ধরা পড়লে বকুনি খেতে হবে, বন্ধ হবে স্কুটার চড়া। তাই ক্ষতস্থান ধুয়ে অ্যান্টিসেপটিক লাগাতে হল। শীতকাল বলে সুবিধে, একটা ফুলহাতা ব্লাউজ পরে রইলাম। কিন্তু সব ক্ষতই কি চেপে ঢেকে রাখা যায়? বয়ঃসন্ধিতে বুদ্ধিভ্রংশতাবশে লেখা একটি নিদোষ চিঠির জবাবহীনতার অপমান আজ শতগুণে ফিরে আসে কেন?

নতুন একটা রেস্টুরেন্ট খুলেছে শহরে। খুব নাম হয়েছে। বিকেলে জ্যেঠু নিয়ে গেল সেখানে খাওয়াতে। বেশ ঝা চকচকে দোকান। মফস্বল শহরের পক্ষে দারুণ রেস্টুরেন্ট।

জ্যেঠুর ব্লাডসুগার ধরা পড়েছে। খাওয়া দাওয়ায় অনেক বারণ আছে। আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, তুমি কিন্তু সব খাবে না। মেনু দাও, আমি বেছে দিচ্ছি।

জ্যেঠু মুখখানা তোম্বা করে বলে, ওরে, একদিনে কিছু হয় না।

না জ্যোঠু, ব্লাডসুগার খুব খারাপ জিনিস। তুমি স্টু আর স্যালাড খাও। আর দুখানা তন্দুরী রুটি।

দু চামচ ফ্রায়েড রাইস খাই?

আচ্ছা, আমার প্লেট থেকে তুলে দিচ্ছি।

তোর কী হয়েছে বল তো! মুখচোখ ফ্যাকাসে লাগছে।

তোমরা সবসময়ে আমাকে লক্ষ্য করো কেন জ্যেঠু? আর কোনও কাজ নেই বুঝি তোমাদের?

আচ্ছা খা। কী যেন একটা বলি বলি করছিল জ্যেঠু। বার বার চেষ্টা করল। বলল না।

সন্ধেটা বেশ কাটল। সুস্বাদু খাবারের পর জ্যেঠু নিয়ে গেল ভিডিও গেম খেলতে। আজ কী যে হল, একদম ভাল স্কোর করতে পারলাম না।

রাতে সারা শরীর জুড়ে ব্যথার তানপুরা বাজতে লাগল। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, ঝঙ্কার তুলছে ব্যথা। চোটটা কতখানি তা আমি পড়ে গিয়ে এমন টের পাইনি ভাল করে। একটু জ্বর-জ্বরও লাগছে কি? একটু বেশি শীত করছে না? তার চেয়েও বেশি, ঘরে একটা হু-হু করে বয়ে যাওয়া কিছু। কী বয়ে যায় আমার ঘরে?

ঘুম আসছিল না। উঠে তিনটে ঘরের আলো জ্বেলে দিলাম। তারপর এ ঘর থেকে ও ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ভূতগ্রস্তের মতো। এইসব ঘরে একদিন ঘুরে বেড়াত আমার সেই বালবিধবা ঠাকুমা রসময়ী। তার জীবনে কোনও রসকষ ছিল না, আনন্দ ছিল না। রসময়ী রেস্টুরেন্টে খেতে পারত না। স্কুটার চালাত না। ভিডিও গেম খেলতে যেত না। রসময়ী শুধু গয়না হাঁটকাত। শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলত। শুধু নিঃসঙ্গতার হাত ধরে বসে থাকত। রসময়ীর বুকের সেই শূন্যতাই কি হু হু করে বয়ে যায় এই ঘরে? তার দীর্ঘশ্বাসই কি কানে আসে আমার?

আলমারির গায়ে মস্ত আয়না। আমি মুখোমুখি টুল পেতে বসলাম। দাদু বলত, বসনের মুখে রসময়ীর আদল আছে।

আছে, আমি জানি। রসময়ীর কয়েকটা ফটো আছে অ্যালবামে। একটু বেশি বয়সের ফটো। তবু মুখের আদল তো বদলায় না। নিখুঁত সুন্দরী। আজ রসময়ীর জন্য আমার একটু কষ্ট হচ্ছিল। আমার জন্য নাকি গয়না রেখে গেছেন তিনি। বড় অবাক কথা। আমি যে জন্মাব তা রসময়ী জানতেন কী করে?

সকালে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারছিলাম না। হাত টাটাচ্ছে, কোমর ব্যথায় অবশ, মাথা ধরেছে। শরীরে বাজছে জ্বরের বাঁশি। তার চেয়েও বড় কথা এই শীতের রোদ-ঝলমল সকালেও আমার চারদিকে সেই হু-হু। সেই খাঁ-খাঁ।

শরীর খারাপ টের পেলে সমস্ত বাড়িটা এসে হামলে পড়বে আমার ওপর। ডাক্তার আসবে, ওষুধ আসবে, বড়মা আর ঠাকুমা এসে থানা গাড়বে ঘরে। সে বড় জ্বালাতন। ছোটোখাটো অসুখ বিসুখ আমি তাই চেপে যাই।

কলেজে যাওয়ার জন্য ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে নিচ্ছিলাম। বড়মা ঘরে এল, কলেজে যাচ্ছিস নাকি?

হ্যাঁ বড়মা।

বেশ।

বড়মা কিছু একটা বলতে চায় আমাকে। সাপের হাঁচি বেদেই চেনে। ওই মুখচোখ, এই অকারণে এসে কলেজে যাচ্ছি কি না খোঁজ নেওয়া এসব পূর্বলক্ষণ আমার চেনা।

জানিস তো, যতীন বোসের বড় ছেলেটা ফিরেছে।

ওটা কোনও খবর নয় বড়মা। সুমিতা আমার বন্ধু।

ও হ্যাঁ, তাই তো! ছেলেটা কিন্তু বেশ।

আমি জবাব না দিয়ে শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে লাগলাম।

বড়মা বললেন, এইসব বলছিল আর কী, বিয়ের কথা টথা চলছে।

আমি বড়মার দিকে ফিরে একটু হাসলাম, কথাটা কী বড়মা?

বড়মা একটু ভয় খেয়ে বলে, ওরে, সে আমি বলিনি। তোর জ্যেঠুই বলছিল, ছেলেটা বড় ভাল। গরিবের ছেলে, স্ট্রাগল করে এত বড় হয়েছে।

বড়মা, আমি আঁচ করতে পারছিলাম।

রাগ করলি নাকি?

না। তোমাদের ওপর রাগ করব কেন? কিন্তু দোহাই তোমাদের, ভুলেও কোনও প্রস্তাব দিও না।

কেন রে?

কারণ আছে।

কলেজেই বেশ বেড়ে গেল জ্বরটা। ক্লাসের পড়া শুনব কী, সারাক্ষণ কানে এক হুতাশনের হু-হু শব্দ। বুকের মধ্যে খাঁ-খাঁ। অফ পিরিয়ডে কলেজের মাঠে রোদে পিঠ দিয়ে গাছতলায় বসে রইলাম। পাশে বসে প্রীতি তার নীতীশের কথা বলতে লাগল। বকবক বকবক। আমার কানে ঢুকলই না। কানে কেবল সেই হু-হু। ঘর-সংসারের মধ্যে যে কী পায় মানুষ!

আমি হঠাৎ প্রীতির দিকে চেয়ে নিষ্ঠুরের মতো বললাম, তোর নীতীশ তোকে কতটা ভালবাসে?

প্রীতি লজ্জা পেয়ে বলে, আর বলিস না। যা পাগল। ওর শ্বাসে প্রশ্বাসে নাকি আমার চিন্তা।

দেখ প্রীতি, যদি ধর হঠাৎ কেউ তোর মুখে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে মারে আর তোর মুখটা যদি ভয়ংকরভাবে পুড়ে যায় একটা চোখ নষ্ট হয়ে যায়, যদি তুই দেখতে বীভৎস হয়ে যাস, তাহলেও কি তোর নীতীশ তোকে বিয়ে করবে? ভালও বাসবে?

প্রীতির মুখটা যা দেখতে হল বলার নয়। আমার দিকে চেয়ে হাঁ করে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, মাগো! তুই কি ডাইনী? ওসব অলক্ষুণে কথা বলে কেউ?

আমি একটা ঘাসের ডাঁটি চিবোতে চিবোতে আনমনে বললাম, ওসব ভালবাসার কোনও দাম আছে যা রূপ-নির্ভর, অবস্থা-নির্ভর, কন্ডিশনাল? আমি বিশ্বাস করি না রে, আমি ভালবাসায় একদম বিশ্বাস করি না। প্রেমিক-প্রেমিকাদের সম্পর্কটা ভীষণ ঠুনকো।

তুই একটা রাক্ষুসী। বুকটা এমন করছে আমার! কী সব যা তা বললি বল তো!

একটু ভেবে দেখিস প্রীতি।

আমার মনটা এত খারাপ লাগছে।

তুই বোকা। তাই জীবনে সুখী হবি। বোকা না হতে পারলে সুখ নেই।

রাতে যখন মস্ত টেবিলে সবাই খেতে বসেছি তখন খেতে খেতে হঠাৎ জ্যেঠু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, শোন বসন। একটু ভেবে একটা কথার জবাব দিস।

আমার খাওয়া থেমে গেল। জ্যেঠুর দিকে চেয়ে বললাম, কী বলবে তা আমি জানি। আমার জবাব হল, না। কিছুতেই না।

সবাই চোখাচোখি করল। নীরব হয়ে গেল।

জ্যেঠু খুব মৃদুস্বরে বলল, ঠিক আছে। তবে ছেলেটা অনেক দিন অপেক্ষা করে ছিল। বিয়ের নাকি প্ল্যানই ছিল না। বাড়ি থেকে খুব চাপাচাপি করায় বলেছে, আমি যার জন্য এতকাল অপেক্ষা করেছি... থাক গে। অমত জানিয়ে দেওয়াই ভাল।

আমি ঘরে চলে এলাম। আমার তিনটে ঘর জুড়ে হু-হু করে এক নির্জনতা বয়ে যেতে লাগল।

দু দিন পর এক ছুটির দুপুরে সুমিতা আমার কার্ডিগান নিয়ে এল। মুখটা শুকনো। বলল, পরে দেখ তো, ফিট করছে কিনা।

পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বেশ ভাল হয়েছে। সুমিতার হাত খুব ভাল।

পছন্দ?

খুব।

সুমিতা বসল। বলল, কার্ডিগানটা শেষ করার জন্য দুদিন রাত জাগলাম। ভাবলাম, এবার শীত পড়েছে, বসনটা হয়তো কার্ডিগানটা ছাড়া কষ্ট পাবে।

আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, দূর, তাড়া ছিল না তো! আমার কত আছে।

তা কি জানি না? তবু ভাবছিলাম, হয়তো এটার জন্যই বসে আছিস। শখের জিনিস তো!

কেন কষ্ট করতে গেলি?

কারও কারও জন্য কষ্ট করেও আরাম আছে। তোরা আমাদের জন্য কম করেছিস? অভাবের দিনে মা তো কাকিমার কাছেই ছুটে আসত!

দেখ সুমি, ওসব শুনলে আমার রাগ হয় তা জানিস? যাদের আছে তারা তো দিতেই পারে। ওতে মহত্ত্বটা কী আছে শুনি!

সুমিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কাকিমার একটা কথা আমার খুব ভাল লাগত। কাকিমা বলত, আমি অন্যের দীর্ঘশ্বাস সইতে পারি না।

আমার মা একজন মহৎ মহিলা, আমি জানি। আমি সেরকম মহৎ হতে পারব না হয়তো! অমন পতিভক্তি, অমন সংসারের মায়া, অমন অভাবের সঙ্গে লড়াই-না, আমি পেরে উঠব না।

সুমিতা হঠাৎ বলল, দাদা কাল চলে যাচ্ছে।

আমি আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গায়ের কার্ডিগানটা দেখতে লাগলাম।

সুমিতা মৃদুস্বরে বলল, তুই ফিরিয়ে দিলি দাদাকে?

আমি জবাব দিলাম না।

সুমিতা একটু ছলছল চোখ করে বলল, আমরা তো জানতাম না যে, দাদার তোকেই পছন্দ। কে জানে কেন। অনেকবার জিজ্ঞেস করেছি, বসনকে তুমি কবে দেখলে দাদা, তুমি তো মেয়েদের মুখের দিকেই তাকাও না। ছিলেও না তো এদেশে। বসনকে তাহলে কবে পছন্দ করলে। দাদা শুধু বলে, ও তুই বুঝবি না। বসনের একটা শোধবোধ পাওনা আছে। কী মানে কথাটার তা জানি না। তুই জানিস?

না তো! আমার সমস্ত শ্রবণ জুড়ে সেই অদৃশ্য হু-হু শব্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বধির করে দিচ্ছে আমাকে।

কত বিয়ের প্রস্তাব আসছে, সব ফিরিয়ে দিল দাদা।

শোন সুমি, তোর দাদাকে খুব গোপনে একটা কথা বলতে পারবি?

কি কথা?

আগে আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর যে, তোর দাদা ছাড়া কাউকে কখনও বলবি না।

আমার ভয় করছে। আচ্ছা, দিব্যি করছি। খারাপ কিছু বলবি না তো!

খারাপ। আমাকে ছুঁয়েছিস, বাড়িতে গিয়ে ভাল করে ডিজইনফেকট্যান্ট দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলিস।

সুমিতা চমকে উঠে বলে, কেন রে?

শোন, খুব বিশ্বাস করে বলছি তোকে। আমার বাড়ির কাউকে বলিনি। বললে খুব হৈ-চৈ হবে। জানিস তো, আমি কত আদরের।

বল না বসন। আমার বুক কাঁপছে।

আমি চমৎকার একখানা অভিনয় করলাম। হঠাৎ শাড়ির আঁচল তুলে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললাম। তারপর কান্নার মধ্যেই বললাম, আমার কুষ্ঠ হয়েছে রে।

সর্বনাশ!

গোপনে ডাক্তার দেখিয়েছি। কাউকে বলিনি।

সুমিতা পাথরের মতো বসে রইল।

খানিকক্ষণ কেঁদে আমি আমার ট্র্যাজিক মুখখানা উন্মোচন করে ধরা গলায় বললাম, তোর দাদাকে বলিস।

সুমিতা ভীত মুখে চেয়ে ছিল আমার দিকে। তারপর বলল, কেন হল রে? ঠিক জানিস তো?

তিনজন ডাক্তার একই কথা বলেছে।

আমি বাঁ হাতখানা খুলে একটু দেখালাম ওকে। ক্ষতের ওপর পুরু ক্রিম দেওয়া ছিল বলে এমনিতেই বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল হাতটা। তার ওপর সুমিতার সাহসই হল না ভাল করে দেখার। সে মুখ ঢেকে ফেলল। হয়তো চোখে জল এল ওর।

বোকা সুমিতা থমথমে মুখ করে চলে যাওয়ার পর একা ঘরে আমার হেসে ওঠাই হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু তার বদলে কান্না এল। প্রেমকে আমার কেন বিশ্বাস হয় না?

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন প্রায়ই দেখতাম, আমাদের সদর দরজার চৌকাঠের পাশে রোজ ভোরবেলা কে বেশ একটা রক্তগোলাপ রেখে যায়। পরে বড় হয়ে একটু একটু করে জেনেছি, যে আমার মায়ের কোনও ব্যর্থ প্রেমিক। প্রতিদিন সে তার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রতীক রেখে যেত দরজার বাইরে। ওই গোলাপটি কুড়িয়ে নেওয়ার লোভে রোজ আমি ভোরবেলা উঠে সদর দরজা খুলতাম। একদিন বোধহয় একটু আগেই দরজা খুলে ফেলেছিলাম। সেদিন লোকটাকে দেখতে পেয়ে যাই। লম্বা, সুন্দর চেহারার একজন মানুষ। হাতে গোলাপ, আমাকে দেখে যেন প্রথমটায় ভয় পেল। তারপর লজ্জায় একটু হাসল। গোলাপটা আমার হাতে দিয়ে কিছু না বলেই চলে গেল। কী যে ভাল লেগেছিল আমার সেদিন!

অনেকদিন হয় আর কেউ গোলাপ রেখে যায় না আমাদের দরজায়। প্রেম কি ফুরিয়ে যায়? ক্লান্ত হয়? শেষ হয়? প্রেম ভয় পায়?

সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িটা বড় নিঝুম। আমার তিনতলার ঘর যেন আরও শব্দহীন আজ। শুধু নীরবে বয়ে যাচ্ছে এক বিরহের স্রোত। হু-হু হু-হু...

সিঁড়িতে একটা পায়ের শব্দ উঠে আসছিল। চেনা শব্দ নয়। আমি সচকিত হলাম। এভাবে কেউ উঠে আসে নাকি? এভাবেই কি আসা উচিত? প্রতিরোধ ভেঙে, ভয় ভেঙে, আমার প্রত্যাখ্যান ডিঙিয়ে কেন আসে ও? কে আসছে আমি যে জানি! কি করে জানি তা তো জানি না।

আমি পড়ার টেবিল থেকে তড়িৎ-গতিতে উঠে পড়লাম। আমি দৌড়ে চলে গেলাম ভিতরের ঘরে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। চোখ ভেসে যাচ্ছিল জলে।

পায়ের শব্দটা আমার চৌকাঠে এসে থেমে আছে। সেই নিরন্তর হু-হু শব্দটা ধীরে ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল।